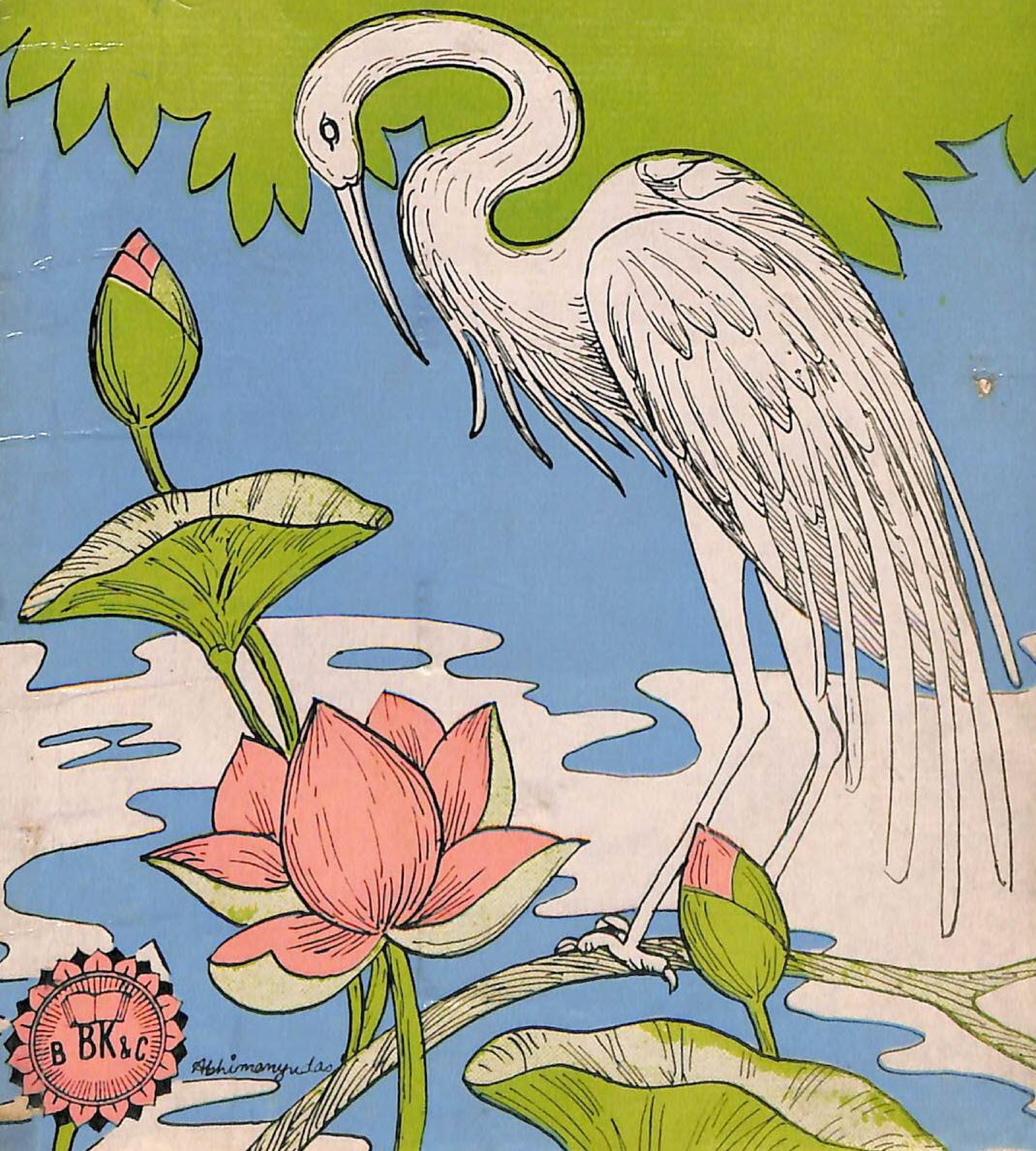
সাহিত্যদর্পণ



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VIII. Vide Notification No. T.B./76/8 T.B./10. Dated 26.12.76

সাহিত্য দর্পণ

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. বি-এড্ (প্রথম শ্রেণী),
বাংলা বিভাগীয় প্রধান, বেহালা হাইস্কুল, কলিকাতা
ও
শ্রীরঞ্জিতকুমার ঘোষ, বি. এ. বি-এড্
(সাহিত্য) ও ইতিহাসের প্রধান শিক্ষক, খোলাপাতা
শ্রীঅরবিন্দ তপোবন পাঠমন্দির উচ্চ-বিদ্যালয়,
খোলাপাতা, ২৪-পরগনা

বি.বি. কুণ্ডু এণ্ড কোং
১৬, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী মৃদুলা কুণ্ডু
১৬, নবীন কুণ্ডু লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮১
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৮২
তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮৩
চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৪
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৫
ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮৬

[redacted]

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীল কুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

বিষয়সূচী

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



শ্রমের মর্যাদা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[লেখক-পরিচিতি : মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতীদেবী। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে পাঠ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ইংরাজী শাস্ত্রেও তিনি জ্ঞান লাভ করেন।

বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে একটি শিল্পসম্মত রূপদান করেন। তাঁর সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করে। বিদ্যাসাগর ছিলেন একাধারে শিক্ষাব্রতী, সমাজ-সংস্কারক ও পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ দয়াগুণের জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।]

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও-না-কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না ; ভিক্ষা করিলে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোনও কোনও বস্তু পাওয়া যাইতে পারে ; ভিক্ষা করা ভদ্রলোকের কর্ম নয়। যে ভিক্ষা করে, সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণ্য ও অশ্রদ্ধার ভাজন হয়।

যদি কোনও ব্যক্তি কখনও পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্মাণ ও কৃষিকর্ম সম্পন্ন হইত না, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য-পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না, সকল লোক দুঃখে কালযাপন করিত, পৃথিবী এক্ষণে, অপেক্ষাকৃত যেরূপ সুখের স্থান হইয়াছে, সেরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও ধনবান হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া ধনবান হয়, যথার্থ বটে ; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্ব-পুরুষেরা, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ

প্রভৃতি পরিশ্রম দ্বারা ঐ ধন উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে; সুতরাং সেই কয়জন ভিন্ন, সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হয়।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করে। অর্থ না হইলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া যাইবে; সমস্ত বস্ত্র ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবে এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে, সমস্তই কালক্রমে শেষ হইবে। তাহা হইলে সকল লোককে নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যতদিন কর্মক্ষম না হয়, পিতামাতা তাদের প্রতিপালন করেন। অতএব, যখন পিতামাতা বৃদ্ধ হইয়া কর্ম করিতে অক্ষম হন, তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্যকর্তব্য কর্ম; না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য সে সর্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস এবং বড় হইয়া ধনোপার্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করে, অথবা অন্যের দত্ত যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সে বস্তু তাহার। সে ভিন্ন অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত। লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যে বস্তু উপার্জন করিব, তাহা আমারই থাকিবে, অন্যে লইতে পারিবে না, এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে

প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু সে যদি জানিত, আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবে, তাহা হইলে তাহার কখনও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত ; অজ্ঞাতসারে বা বলপূর্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া লইলে, অপহরণ করা হয়।

যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায়, তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত ; আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। দেখ, ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহভোগ করিতে হয় ; তাহার কত অপমান ; সে সকলের ঘৃণাস্পদ হয় ; চোর বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না ; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না। অতএব, প্রাণান্তেও পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করা উচিত নহে।

কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে, তাহাতে সকল লোকের সমান অধিকার ; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইতে পারে। বায়ু, সূর্যের আলোক, বৃষ্টি ও নদীর জল—এ সমস্ত এবং এরূপ আর আর বস্তুতে সকল লোকেরই সমান অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর কোনও বস্তু পাইবার বাঞ্ছা করিলে, অবশ্যই পরিশ্রম করিতে হইবে, বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। পরিশ্রম না করলে কি ফল হয়? পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন না করলে কি অসুবিধা হয়?

২। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

৩। পরিশ্রম করে অধিকার অর্জনের যুক্তি দেখাও।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা।

(খ) চুরি করা বড় দোষ।

৫। পরিশ্রমের মর্যাদা—এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কোন্ কোন্ বস্তুতে সকলের সমান অধিকার ?

২। "বিনা পরিশ্রমে এরূপ ধনলাভ অল্প লোকের ঘটে।"—(ক) এরূপ ধনলাভ বলতে কি বোঝ ? (খ) কেন অল্প লোকের তা ঘটে ?

৩। 'সে নিতান্ত নিস্তেজ ও নীচাশয়'—কে এবং কেন ?

৪। 'এজন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়'—কাহার ? কেন প্রবৃত্তি হয় ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর :

নীচাশয়, সম্ভাবনা, ঘৃণাস্পদ, পৈতৃক, অর্থসাধ্য, জীবিকানির্বাহ, অবশ্যকর্তব্য, হতভাগ্য, যাবজ্জীবন, অজ্ঞাতসারে।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

এতদ্ভিন্ন, নীচাশয়, হস্তার্পণ, প্রাণান্ত, অতএব, ধনোপার্জন, যাবজ্জীবন, বিদ্যাভ্যাস, নিস্তেজ।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

নিস্তেজ, পরিশ্রম, উপার্জন, সাধারণ, অভ্যাস, হতভাগ্য, সমর্থ, পাঠ্য, অজ্ঞাতসারে, ঘৃণাস্পদ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে। তাদের বিপরীত শব্দও পরে দেওয়া হল। শব্দ ও তার বিপরীত শব্দ গুচ্ছ করে লেখ :

শব্দ : সম্পন্ন, অর্থ, সমর্থ, অক্ষম, অনভ্যাস, দোষ, অধিকার, অসমান।

বিপরীত শব্দ : অনর্থ, সক্ষম, অভ্যাস, অনধিকার, সমান, গুরু, অসমর্থ, গুণ।

২। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) বিনা —— কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না।

(খ) পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও —— হইতে পারে না।

(গ) বালকেরা পরিশ্রম করিয়া —— করিতে সমর্থ নহে।

(ঘ) কতকগুলি সাধারণ বস্তু আছে, তাহাতে সকল লোকের সমান ——।

পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে আলোচনা-
রা হয়েছে।



পথিপার্শ্বে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক-পরিচিতি : ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—১৮৯৪) জন্ম। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা এই সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যে কতভাবে উন্নত করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একাধারে ইনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও হাস্যরসিক। তাঁহার রচিত 'আনন্দমঠ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরাণী' 'রাজসিংহ', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।]

বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে তো দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, সুপথ, কুপথ সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারে স্তূপ-স্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোক অপেক্ষা আঁধার ভালো। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠ নিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইতে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কী একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্তের জন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটিকে দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র, তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ-ঘাট-গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশু-সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা

পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীর মধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আসছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ প্রজ্বলিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময় বিশেষে তাহার সৌন্দর্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এখন সৌন্দর্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন এবং শত স্থানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট, আমি দেখিতেছি। কিন্তু তাপ-সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুষ্কবস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে

আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু ক'রে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া, অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল! দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কী বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কী?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্যমুখী।"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন:

১। প্রবন্ধটি পাঠ করে লেখক বর্ণিত বর্ষাকালীন দিনটির বর্ণনা তোমার নিজ ভাষায় লেখ।

২। "তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী"—(ক) এই সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর বর্ণনা দাও। (খ) তিনি যে সময় পথে চলছিলেন, সে সময় আকাশের অবস্থা কেমন ছিল? (গ) পথে প্রাপ্ত মৃতবৎ স্ত্রীলোকটিকে পেয়ে তিনি কি করলেন?

৩। "যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, সুপথ, কুপথ সব সমান"—উক্তিটি কোন্ গল্পে আছে। গল্পটি কার লেখা? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথার অবতারণা করা হয়েছে? উক্তিটি পড়ে তুমি কি বুঝলে?

৪। "যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।"—কি প্রসঙ্গে কে এই মন্তব্য করেছেন? এই বক্তব্যের পক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'হরমণির গোরু ছিল'—হরমণি কে? কেন গোরুর কথা এল?

২। 'এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই।'—কার উক্তি? ঠাকুর কে?

৩। 'আমার নাম সূর্যমুখী।'—উক্তিটি কার? কোন্ গল্পে কথাগুলি আছে? গল্পটি কার লেখা? কার কোন্ প্রশ্নে মহিলা তার নাম জানাল?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর : তৈজস, মসীময়ী, বৃক্ষ, শিরোমালা, অলৌকিক, ব্যথাব্যঞ্জক, কবরী, নিমীলিত, উন্মীলিত।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

সূর্যোদয়, কৃষ্ণাবগুণ্ঠন, বিদ্যুদালোক, প্রতীক্ষা, মরণোন্মুখ, পরোপকারী, কিঞ্চিৎ।

৩। স্থূলাক্ষর পদের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) আকাশ **মেঘে** ঢাকা।

(খ) অচিরাৎ কোমল **মনুষ্যদেহে** করস্পর্শ হইল।

(গ) **দুর্গে!** এ যে স্ত্রীলোক।

(ঘ) **তোমার** হাতে রুলি রয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। কার উক্তি বল :

(ক) কে গো তুমি? (খ) ঠাকুর কবে এলেন? (গ) আমি কোথা? (ঘ) আমার নাম সূর্যমুখী।

২। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) তিনি সংসারত্যাগী ——।

(খ) আকাশের মুখে ——।

(গ) শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ——।

(ঘ) স্ত্রীলোকটি —— নহে।

এখানে দুর্যোগময়ী রজনীতে নিভৃত অরণ্যানীর মধ্যে পরোপকারী ব্রহ্মচারীর সেবাপরায়ণতা বর্ণনা করা হয়েছে



শহরের বাবু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক-পরিচিতি : হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬—১৯৩৮ খ্রীঃ) জন্ম। ইনি একাধারে ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সংসারে হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা ও দীনতা-হীনতার ছবি ইহার রচিত উপন্যাসগুলিতে যেভাবে বিধৃত হইয়াছে, তাহা তুলনাবিহীন। নারী-চরিত্র রূপায়ণে ইনি ছিলেন সবিশেষ দক্ষ। অসাধারণ জনপ্রিয় এই ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির অন্যতম হইতেছে : 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'দেবদাস', 'পল্লী-সমাজ', 'দত্তা', 'পরিণীতা', 'বিন্দুর ছেলে', গৃহদাহ', 'শেষ প্রশ্ন', 'বামুনের মেয়ে', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি।]

দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুন-দা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, পাম্পসু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপী—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া, আমার হাত

ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকাইয়া বসিলেন।

"তোর নাম কি রে?"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম,—"শ্রীকান্ত।"

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত—শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ্। ইন্দ্র, হুঁকো কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক!"

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও তো এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজছি।"

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রের মাসতুতো ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এফ. এ. পাস করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত! তোর গায়ে ওটা কালপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। পেতে দে দেখি—বসি।"

"আমি দিচ্চি নতুন-দা। আমার শীত করচে না—এই নাও" বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, "নতুন-দা, এ যে ভারি মুস্কিল হ'ল—হাওয়া পড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না।"

নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।" কলকাতাবাসী নতুন-দার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল,

"দাঁড়! কারুর সাধ্য নেই, নতুন-দা, এই রেত ঠেলে উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নতুন-দা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, "তবে আনলি কেন, হতভাগা? যেমন করে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে! আমায় থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ করে ধরেছে।" ইন্দ্র কহিল, "তাদের বাজাবার লোক আছে নতুন-দা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

"না! আটকাবে না। এই দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম! চল্, যেমন করে পারিস্ নিয়ে চল্।" এই বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথার আর প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রের অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, "ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?" কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি নিজেও মনে করিতে পারি না। বলিলেন, "তবে যাও না, টানো গে না হে! জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন?"

তারপর একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁসিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন, এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলিয়া এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া ধরাইতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, "না খুলে—"

"হ্যাঁ। দামী দস্তানাটি মাটি করে ফেলি আর কি? নে—যা করছিস্ কর।"

বস্তুতঃ, আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি, জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য

আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ, আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে এক ফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে পড়িলে কোনরূপ আঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রাম বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গিয়াছে —থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দু'টো বাজিয়া যাইবে শুনিয়া বাবু প্রায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে ইন্দ্র, এদিকে বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?"

ইন্দ্র কহিল, "সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি, নতুন-দা। সব জিনিস পাওয়া যায়।"

"তবে লাগা—লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ, টান না একটু জোরে—ভাত খাসনে? ইন্দ্র, বল না তোর ঐ ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।"

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতে-ছিলাম, তেমনি ভাবে অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, "হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার।" অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নাবাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দু'জনে তাঁর ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে

আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও তো নিস্তার ছিল না।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। "কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু।"—বাবুটি কে? তার বাবুয়ানার পরিচয় দাও।

২। "তবে আনলি কেন হতভাগা?"—কে কোন্ প্রসঙ্গে কাকে একথা বলেছিলেন?

৩। "বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি, জীবনে অল্পই দেখিয়াছি।"—কে এই স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি। তার স্বার্থপরতা ও অসজ্জনতার পরিচয় দাও।

৪। 'তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত' নিস্তার ছিল না।'—কিসের চেষ্টা? চেষ্টা কেন? কার নিস্তার ছিল না?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। শ্রীকান্ত কলিকাতার ভয়ঙ্কর বাবু নতুনদাকে কিরূপ পোশাকে দেখেছিল?

২। 'কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল।'—কার কোন্ কথা শুনে কার মন বিগড়ে গেল? কেন?

৩। কোন্ কথা শুনে নতুনদা এক মুহূর্তেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন? তিনি কোথায় কেন যাচ্ছিলেন?

৪। 'দামী দস্তানাটি মাটি করে ফেলি আর কি?'—এ কার উক্তি? কার কথা শুনে তিনি একথা বলেছিলেন? কেন তিনি দস্তানা খুলতে চাননি?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

ভয়ঙ্কর, গলাবন্ধ, পাম্পসু, দস্তানা, অপ্রতিভ, ব্যাকুল, সঙ্কট, স্বার্থপর, চরিতার্থ, উদ্রেক, অনতিকাল, সৈকতে।

২। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

অন্ত, কঠোর, প্রসন্নমুখে, প্রশ্ন, প্রশস্ত, ঠাণ্ডায়, অসজ্জন, বিচলিত, অবিশ্রাম, বিপদ, সঙ্কীর্ণ, নাবা।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। নীচের শব্দগুলি ঠিকমত শূন্যস্থানে বসাও :

সঙ্কীর্ণ, শুভ্র, জ্যোৎস্নার, অবিশ্রাম, কঠোর, ভয়ঙ্কর।

(ক) —বাবু ; (খ) —মত ; (গ) —চেঁচামেচি ; (ঘ) —জলে ; (ঙ) —সৈকতে ; (চ) —আলোকে।

২। কার উক্তি বল :

(ক) তোর নাম কিরে ? (খ) আমার শীত করছে না। (গ) হাত-পা একটু খেলানো চাই। (ঘ) ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না ?

৩। এই গল্পে যে যে ইংরাজী কথা প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের নিয়ে একটি তালিকা কর।

স্বার্থপর, অসজ্জন লোকদের অমানবিক ক্রিয়াকলাপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে,



বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সম্পাদক হিসেবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৬৭—১৯২৩ খ্রীঃ) নাম সুপরিচিত। 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের ইনি সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবুলফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী'র অনুবাদ করিয়া ইনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।]

বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙ্গালীর যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে, (১) বাঙ্গালীর উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে, (২) বঙ্গভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে, (৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্যন্ত প্রায় সাতশত বর্ষকাল কোন্ সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাহা জানিতে হইবে, (৪) বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব ও কুলপঞ্জীর পূর্ণরূপে পরিচয় লইতে হইবে। জানিয়া রাখিতে হইবে,—বৌদ্ধযুগে ধর্ম, কর্ম, শীল আচার সম্বন্ধে বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান। উপাসনা-পদ্ধতি, কর্ম-পদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা, জাতিতত্ত্ব ও কুলপঞ্জীর সম্বন্ধে ইংরাজী যুগে ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী স্বদেশের ও স্ব-জাতির পরিচয় রাখে না।

বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সে পরিচয় পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাঙ্গালা ভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়। সিদ্ধাচার্যগণের গীত ও দোঁহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি

পর্যন্ত সমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মন্থন আবশ্যক। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। কবির গান, পাঁচালী গান, শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীত-সাহিত্য আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ আজিও কেহ করে নাই। বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় উপনিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালার 'আগমনী গান' বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব ; আগমনী গান আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি এমন গান রচনা করিতেও জানে না।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরে সর্বত্র,—শিল্পকলায়, গানে, নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্মাণে, লাঠি-খেলায়, নৌ-শিল্পে, কথকতায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন-বিলাসে, গজদন্তের কারুকার্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে, সমগ্র জাতির সকল প্রকার ব্যসন-বিলাস ও উৎসব পার্বণে যেন স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, তাহাদের গঠনভঙ্গিমা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ভাস্কর্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে। বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ঢোল বাজানো অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ।

বাঙ্গালীর গৃহনির্মাণ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের —বুঝি বা পৃথিবীর—আর কোন জাতিতে পারে না। বাঙ্গালার শঙ্খের কাজ বাঙ্গালীর নিজস্ব ; উহা বাঙ্গালার বাহিরে ছিল না—নাই। এমন কি বাঙ্গালার জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জন্মেজয় প্রভৃতি কর্মকারগণ যেমন তোপ, কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিগরেরা তেমনটি পারিত না ; 'জাহানকোশা', 'দলমাদল', 'কালে খাঁ' প্রভৃতি কামান আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীরা নৌ-বিদ্যায় সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা চালাইতে বা জাল বুনিতে ভারতে আর কোন জাতি পারিত না। বাঙ্গালার ষাট বৈঠার ছিপে চড়িয়া মীরকাশেম এক রাত্রিতে গোদাগাড়ী হইতে মুঙ্গের গিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার আর একটি শিল্প ছিল—কুসুমশিল্প। আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ মোহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"কি আর মণিমুক্তা, চুনীপান্নার লোভ দেখাও পিতঃ! বাঙ্গালীর কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারসকলকে হেলায় পরাজয় করে, এমনটি তুমি দেখ নাই।" সেই শিল্প আজ লোপ পাইয়াছে।

বাঙ্গালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্য ভারতে সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির আমদানি করিয়াও বাঙ্গালায় যাগ-যজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। মুঘলদের আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, অধিকন্তু আগন্তুকগণকে—বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল।

স্বীকার করি বটে যে, বাঙ্গালী আর্যাবর্ত হইতে, আর্যগণের নিকট হইতে—অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকে বাঙ্গালীর মণীষা যেন বাঙ্গালার কোমল পেলব পলি-মাটির আবরণ দিয়া এতই কমনীয় ও রসাল করিয়া তুলিয়াছিল যে, পরে উহা আর্যাবর্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান'—উক্তিটি কোন্ প্রবন্ধে আছে? কার উক্তি? কোন্ কোন্ বিষয়ে বাঙ্গালী অন্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র? এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেতে হলে কোন্ কোন্ বিষয় জানা দরকার?

২। 'বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়েছে।'—এই ভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লেখকের উক্তিকে সপ্রমাণ কর।

৩। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ শরীরে সর্বত্র—ব্যাখ্যা কর।

৪। নৌবিদ্যায়, লৌহদ্রব্য নির্মাণে, গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে এবং কুসুমশিল্পে বাঙ্গালী যে এককালে অনন্য ছিল, তার পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'স্বীকার করি বটে যে……স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল।'—

(ক) আর্যাবর্ত কি? (খ) আর্য কারা? (গ) আর্যদের কাছ থেকে বাঙ্গালী কিসে ঋণী ছিল? (ঘ) কিভাবে আর্যসভ্যতা থেকে বাঙ্গালীর সভ্যতা পৃথক হল?

২। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

(ক) আগমনী গান, (খ) সিদ্ধাচার্যগণের গীত ও দোঁহাবলী, (গ) গীতাঞ্জলি।

৩। এঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ :

জনার্দন, বিশ্বম্ভর, আওরঙ্গজেব, মীরকাশেম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর :

বিশিষ্টতা, জাতিতত্ত্ব, উপাদান, উপনিষদ, গঠনভঙ্গিমা, ভাস্কর্য, অনন্যসাধারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী, আবরণ।

২। পদান্তর কর :

বিশিষ্টতা, পরিচয়, বিশ্লেষণ, রাষ্ট্রিক, অপরাজেয়, প্রতিদ্বন্দ্বী, মণীষা, কমনীয়, রসাল, প্রকট, পৃথিবী।

৩। অর্থপার্থক্য লেখ :

উপাদান—উপাধান ; গাথা—গাঁথা ; সাক্ষ্য—সাক্ষী ; শীল—সীল।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। তিনটি সজ্জিত কর :

বিশ্বম্ভর	কালে খাঁ
জনার্দন	দলমাদল
জন্মেজয়	জাহানকোশা

সর্বক্ষেত্রে বাঙ্গালী কীভাবে তার স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছে তারই আলোচনা করা হয়েছে এখানে।



নিউটনের কীর্তি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

লেখক-পরিচিতি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় রামেন্দ্রসুন্দরের (১৮৫৪—১৯১৯ খ্রীঃ) জন্ম। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে কৌতুকরসাত্মক ভাষার প্রয়োগ ইঁহার এক বিশেষ কৃতিত্ব। 'চরিতকথা', 'জিজ্ঞাসা', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি ইঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির অন্যতম।

নিউটনের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার মত জ্ঞানী লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। পুরাতন হইলেও নিউটনের সম্বন্ধে একটি কথা আজ বলিব।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন, সেই বৎসর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। গ্যালিলিও ইটালিদেশবাসী ছিলেন। গ্যালিলিওর নাম পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত। গ্যালিলিও "পেণ্ডুলামযুক্ত" ঘড়ি বাহির করেন। গ্যালিলিও আরও অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেকথা বলিবার দরকার নাই। গ্যালিলিও খুব বড় লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড় লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ কি? তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন

স্থির করিলেন—পৃথিবীর, এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয়তো তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু এই গল্প নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুতঃ নিউটন ঐরূপ কিছু একটা কাজ করেন নাই।

প্রথমতঃ, অনেকে সন্দেহ করেন, গল্পটা হয়ত আদৌ সত্য নহে। আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক, বা না হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে কিরূপে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে নিউটনের বহু বৎসর চিন্তা করিতে হইয়াছিল। একদিনে অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই ; এবং বহু বৎসর তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া মনুষ্যজাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদিগকে এখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিব না। আশা করি কালক্রমে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

তথাপি স্থূল কথাটা জানা ভাল। তোমাদের যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে পৃথিবীর ভিতরে মাধ্যাকর্ষণ নামে একটা শক্তি আছে, তাহারই বলে পৃথিবী অন্য পদার্থকে টানে, আর অন্য পদার্থে সে শক্তি নাই, তাই তাহারা পৃথিবীকে টানিতে পারে না, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস ভুল। বস্তুতঃ নিউটন সেইরূপ কিছু আবিষ্কার করেন নাই। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে পৃথিবী কোন পদার্থকে স্বয়ং আকর্ষণ করিতে পারে, নিউটন তাহা নিজেই বিশ্বাস করিতেন না।

তবে নিউটনের কাজটা কি? একটা ফল হাত হইতে ফেলিলে উপরে না যাইয়া নিম্নে পৃথিবীর দিকে চলে। ইহা তোমরাও জান, নিউটনও জানিতেন, তাহার পূর্বেও লোকে জানিত। পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে বলিলে সেই কথাটা ঘুরাইয়া বলা হইল। নূতন কথা কিছুই হইল না। নিউটন এমন নির্বোধের মত লোক ছিলেন না যে, একটা কথাকে ঘুরাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লইবেন।

তবে নিউটনের বাহাত্তরী কিসে ? অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে দেখেছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি ফলের দিকে যায় ! অন্য লোকে দেখে —পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে ; নিউটন দেখিয়াছিলেন ফলটিও পৃথিবীটাকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে, প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীটাকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, সে আবার কি ? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন ? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন ?

উত্তর এই—পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিকদূর কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়া তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয়ত আশ্চর্য হইবে। বলিবে,—কৈ, চন্দ্র ত কতদিন আমাদের মাথার উপর উঠে ; ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ ?

কিন্তু আশ্চর্য হইও না। চন্দ্র বস্তুতঃ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। যেদিন চন্দ্রের সৃষ্টি, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ

পর্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিলে আরও অধিক দূর চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিসটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। আরও বেগে দিলে হয়ত দু'শ তিনশ কি দু'হাজার তিন হাজার হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগে দিতে পারিলে হয়ত গঙ্গা পার হইয়া হাবড়াতে না হয় গুজরাটে, না হয় মক্কায় গিয়া পড়িত। আমরা সেইরূপ দিতে পারি না, তাই অতদূর যায় না। অধিক বেগে দিবার উপায় থাকিলে আমরা উহাকে মক্কা কেন—আফ্রিকা পার করিয়া আটলান্টিক সাগরে ফেলিতে পারিতাম। যত দূর যাউক, পৃথিবীতে উহাকে পড়িতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগ দিলে পৃথিবীতে না পড়িয়া একবার পৃথিবীটা ঘুরিয়া আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছছাড়া হইতে পারিত না।

মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র একদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত। তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মত প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই ভাঙ্গিয়া যাইত।

একগাছি লম্বা সূতার এক প্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তারপর ডান হাতে দু'টি আঙ্গুলে করিয়া ঢিলটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও; সুতাগাছটি যেন বরাবর টানের উপর থাকে। আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলে দেখিবে ঢিলটি আবার স্বস্থানমুখে চলিল, যেন সেই স্বস্থানের দিকে তাহার একটা

টান আছে। যেখানেই ধর না কেন, ছাড়িয়া দিলে আবার সেই স্থানেই যাইবে ; কিন্তু একবার ঐরূপে সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার দেখ আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না ; তবে স্বস্থানকে মধ্যবর্তী করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেরূপ রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকে যাইতে চাহে ; তবে কে কবে তাহাকে পাশ দিয়া পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে, পৃথিবীর নিকট যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটনই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকে ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘোরে, ইচ্ছা করিলে অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে ; তাহার অন্যপথে যাইবার যো নেই। তবে বলদ ঘানিগাছে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা থাকে, তাই ঘানিগাছের দিকে তাহার টান। আর চন্দ্র পৃথিবীর দিকে সেইরূপ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কোন দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। নিউটনও তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছুই বলিয়া যান নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় কলুর বলদের মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে তাহা আমরা জানি না। হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে, আম, নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপে পৃথিবীতে পড়ে, চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, পৃথিব্যাদি পদার্থও ঠিক সেই নিয়মে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য যাহার মধ্যস্থল, সাড়ে

চার কোটি ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতের একটি সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতে সর্বত্র একই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও ইহার দিকে চলিতেছে, এ ইহাকে ঘুরিতেছে, ও উহাকে ঘুরিতেছে।

স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহাতে তোমরা মনে করিও না যে, এই ব্যাখ্যায় নিউটনের ক্ষমতার সহস্রাংশেরও পরিচয় পাইলে। যদি এই ব্যাখ্যা শুনিয়া নিউটন কত বড় লোক ছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই প্রস্তাবের পাঠ সফল হইবে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'কিন্তু এই গল্প নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়।'—এখানে কোন্ গল্পের কথা বলা হয়েছে? সেই গল্প থেকে কোন্ আবিষ্কারের কথা জানা যায়? কেন ইহা নিউটনের খ্যাতি কমায়?

২। 'চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে'—বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট কর। সত্যই কি চন্দ্র পৃথিবীর দিকে পড়ে?

৩। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব কি? নিউটন কিভাবে এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন? একটি উদাহরণ দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৪। 'স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।'—নিউটনের কোন্ নীতিকথার বিষয় এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়েছে? কয়েকটি তথ্যসহ তা ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'গ্যালিলিওর নাম পণ্ডিত সমাজে বিখ্যাত।'—গ্যালিলিও কে? তিনি কোন্ দেশের লোক?

২। 'কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষা বড় লোক।'—নিউটন কে? 'তাঁহার' বলতে এখানে কার কথা নির্দেশ করা হয়েছে? কেন তিনি ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড়?

৩। ফল পৃথিবীর উপর পড়ে ; পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন ?

৪। ‘শুধু চন্দ্র কেন’—আর কে কার চারদিকে ঘুরছে ?

৫। ‘চন্দ্র পড়ে কৈ’—কেন পড়ে না ? সে কি করে ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ও বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা কর ঃ
সফল, অগোচর, খ্যাতি, নির্বোধ, প্রকাণ্ড, নিয়ম।

২। সমশব্দ লেখ ঃ
চন্দ্র, পৃথিবী, সূর্য, সাগর।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ ঃ
বৃক্ষচ্যুত, পণ্ডিতসমাজ, মাধ্যাকর্ষণ, নির্বোধ, ক্রমাগত, দড়াদড়ি।

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ
নির্বোধ, পৃথিব্যাদি, তথাপি, ক্রমাগত, আবিষ্কার।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। এক-একটি বাক্যে এদের পরিচয় দাও ঃ
সূর্য, পৃথিবী, আটলান্টিক, চন্দ্র, গুজরাট, মক্কা, আফ্রিকা।

২। শূন্যস্থানে পাঠের কথা বসাও ঃ

(ক) গ্যালিলিও —— ঘড়ি বাহির করেন। (খ) নিউটন —— নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (গ) চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে — ছুঁড়িয়া দিয়াছে। (ঘ) শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং —— সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। (ঙ) একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক —— পড়ে।

৩। নীচের কথাগুলি উপযুক্ত শূন্যস্থানে বসাও ঃ
ক্ষুদ্র, সামান্য, লক্ষ, পৃথিবী, মাধ্যাকর্ষণ।
——ক্রোশ, প্রকাণ্ড ——, —— ফল, —— পদার্থ, —— শক্তি।

———

অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় নিউটনের
...াকর্ষী কীভাবে তা আলোচনা করা হয়েছে।



স্থান—চাণক্যের বাটী। কাল—প্রভাত।

(চাণক্য একাকী)

চাণক্য—একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন)—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ করতে পারে না। (পরে স্থির-নেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা—একদিন ছিল কি ?

(প্রহরীবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ)

চাণক্য—এই যে, এসেছ ? এস, বন্ধু।

কাত্যায়ন—ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি, চাণক্য ? আমি তোমার বন্দী। অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

চাণক্য—বন্ধন উন্মোচন ক'রে দাও প্রহরী।

(প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল)

চাণক্য—এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নেই।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নেই বটে! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী।

চাণক্য—তোমারা বাহিরে যাও।

(প্রহরীগণ চলিয়া গেল)

চাণক্য—আর আমাদের প্রভেদ নেই, বন্ধু।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নেই!—তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্তই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হ'তে পারে। আমি বন্দী—আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা।

চাণক্য—এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও, তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর। (ছোরা দিলেন)

কাত্যায়ন—তোমার কি অভিপ্রায়, চাণক্য? তুমি কুটিল; তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য—আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি—আমি এই মুহূর্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করছি—তুমি যদি চাও। তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পারবে, আমি পারিনি।

কাত্যায়ন—সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য—সব ভ্রম। হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে, আমার কঠোর শাসনে যা স্বপ্নের প্রাসাদের মত অভ্রভেদ ক'রে উঠ্‌ছে, তা স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে লীন হয়ে যাবে। এ বাড়ী নয়, এ ইটের পাঁজা! এ বৃক্ষ নয়, শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আনতে পারি না। শূদ্রকে চোখ রাঙিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না—রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস? আমি কি করেছি—কি করেছি!

কাত্যায়ন—কি করেছো?

চাণক্য—ঐ বৌদ্ধধর্মের বন্যা আসছে—আমি দূর-ভবিষ্যতে কি দেখছি জানো?

কাত্যায়ন—কি ?

চাণক্য—এই পুনরায় বিখণ্ডিত সাম্রাজ্যের উপরে প্রেতের ভৈরব নৃত্য! তারপর এক মহাশক্তি এই গলিত শবের উপর তার যাদুদণ্ড বুলিয়ে সেই খণ্ডিত মাংসপিণ্ডকে এক ক'রে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করবে; আর তার ন্যায়-শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চ'ষে সমভূমি করবে। —নাও এ মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন—কি দামে বিকোচ্ছো ?

চাণক্য—তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন—উত্তম অভিনয়।

চাণক্য—অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর, বন্ধু; আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট-কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা করেছে। সব করেছি, কিন্তু তা'তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। পারবো কোথা থেকে! বাহিরে এই মণীষা কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ, বন্ধু! এ শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নেই, স্নেহ নেই, বিশ্বাস নেই! শাঁস নেই, খোসা নিয়ে কি করব? ভেঙ্গে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই।

(বক্ষে করাঘাত)

কাত্যায়ন—তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছো, চাণক্য!

চাণক্য—(ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) এই সুন্দর প্রভাত—ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজেছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমিই দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে তাই দেখছি।

কাত্যায়ন—চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য—এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তা'র কেউ নই। একা আমি এই অসীম সৌন্দর্য-রাজ্য থেকে নির্বাসিত।

কাত্যায়ন—আশ্চর্য! এ রূপ কখনও দেখিনি।

চাণক্য—তবু একদিন ছিল—

(দূরে সঙ্গীত)

চাণক্য—তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসব-মন্দির বলে বোধ হ'ত। তারপর—

(সঙ্গীত নিকটবর্তী হইল)

চাণক্য—(উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া) সেই স্বর! কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন।

কাত্যায়ন—কা'কে?

চাণক্য—ঐ ভিক্ষুককে আর ভিক্ষুক-বালাকে।

কাত্যায়ন—সে কি! তুমি কি—

চাণক্য—(সানুনয়ে) যাও ভাই—(কাত্যায়নের প্রস্থান)

চাণক্য—কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়! (ঘর্ম মুছিলেন)।

(গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুক-বালার প্রবেশ)

চাণক্য—(বালিকাকে) এই দিকে এস ত মা।

(বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল)

চাণক্য—(তার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) একেবারে সেই মুখ। সেই চক্ষু দু'টি! একেবারে, অথচ—ভিক্ষুক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—এ তোমার কন্যা? সত্য বল।

ভিক্ষুক—আমার বৈ আর কা'র?

চাণক্য—সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক—না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য—(সাগ্রহে) তবে তোমার মেয়ে নয়?

ভিক্ষুক—না বাবা। কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য—কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক—ভগবান দিয়েছেন। নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দুটি হারিয়েছি।

চাণক্য—(সমধিক আগ্রহে) দস্যু ছিলে! ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ?

ভিক্ষুক—দিয়েছি বৈ কি, বাবা!

চাণক্য—মেয়ে কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক—অবন্তীপুরে, বাবা।

চাণক্য—(উত্তেজিতভাবে) অবন্তীপুরে? কোন্ জায়গায়?

ভিক্ষুক—পথে।

চাণক্য—না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি ক'রে এনেছিলে?

ভিক্ষুক—হাঁ, বাবা!

চাণক্য—নদীর ধারে বাড়ী?

ভিক্ষুক—আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য—(বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) হৃদয়! উদ্বেলিত হয়ো না—তখন এর বয়স?

ভিক্ষুক—তিন চারি বৎসর, বাবা।

চাণক্য—এর নাম কি বলেছিল?

ভিক্ষুক—আত্তিরি!

চাণক্য—আত্রেয়ী! শুনছো কাত্যায়ন? বলছে আত্রেয়ী? এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক—চাণক্য।

চাণক্য—(লাফাইয়া উঠিয়া, উচ্চৈস্বরে) দস্যু!—না, তোমায় মারবো না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবো না। কোন ভয় নেই।

কাত্যায়ন—রক্ষী!

(রক্ষীগণের প্রবেশ)

চাণক্য—না, যাও।—ভিক্ষুক! আমি সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার।

ভিক্ষুক—আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না, বাবা। এ আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাবো না।

চাণক্য—তোমায় এক রাজ্য-খণ্ড দেব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো! তুমি আমায় সম্রাট করেছো; তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে আবার স্বর্গে উঠিয়েছো। আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা করব। না, না—একি! এ আনন্দ, না দুঃখ?

কাত্যায়ন—চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য—না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র—তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ন!—কাত্যায়ন! নাড়ী দেখতে জানো? দেখ তো (হাত বাড়াইলেন), আমি বেঁচে আছি কি না?

কাত্যায়ন—চাণক্য, প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য—না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী—মা আমার! এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি! কোথায় ছিলি পাষাণি মা! (কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন)—কাত্যায়ন! শোন কুঞ্জবনে একটা সাম-স্তোত্র উঠছে না? দেখ, ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, আকাশ থেকে স্নিগ্ধ সৌরভ-হিল্লোল ভেসে আসছে। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, আমাকে কুটীরে নিয়ে চল, কাত্যায়ন।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন:

১। 'দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো! তুমি আমায় সম্রাট করেছো।'—কে কাকে কখন এই উক্তি করেছে? যার প্রতি এই উক্তি করা হয়েছে, সে কিভাবে বক্তাকে একাধারে ভিখারী ও সম্রাট করেছে?

২। এই নাট্যাংশ অবলম্বনে দেখাও চাণক্যের জীবনে কিভাবে স্নেহের জয় হল?

৩। নাট্যাংশে চাণক্যের যে কঠোর-কোমল রূপ প্রকাশিত হয়েছে; তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর:

(ক) এ বাড়ি নয়, এ ইটের পাঁজা! এ বৃক্ষ নয়, শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ।

(খ) চাণক্য জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা করেছে।

(গ) আমি তোমায় বধ করে তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা করব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ করতে পারে না।'—উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে তিনি এ উক্তি করেছেন? এরূপ উক্তির কারণ কি?

২। 'সব করেছি, কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না'—বক্তা কে? তিনি কি কি করেছেন? তাঁর আক্ষেপের কারণ কি?

৩। 'তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর'—কে কাকে কখন একথা বলেছিলেন?

৪। 'আমি অদূর ভবিষ্যতে কি দেখছি জানো?'—কে বক্তা? তিনি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে কি দেখছেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। পদান্তর কর :

করুণা, নির্বাসিত, কুটিল, দীন, স্নিগ্ধ।

২। অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :

বিচক্ষণ, ক্ষিপ্ত, দ্বারস্থ, নির্বাসিত, আমূল, ইঙ্গিত, অভিসন্ধি, রোমাঞ্চিত।

৩। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) **রাক্ষসি**, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্?

(খ) আজ **আমি** বড় দীন।

(গ) এ **আমার** মেয়ে নয়।

(ঘ) **মেয়ে** কোথায় পেলে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। কার উক্তি বল :

(ক) তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছো, চাণক্য!

(খ) ভগবান দিয়েছেন।

(গ) অবন্তীপুরে? কোন্ জায়গায়?

২। এক-একটি বাক্যে এদের পরিচয় লেখ :

বৌদ্ধধর্ম, অবন্তীপুর, কাত্যায়ন, চাণক্য।

চাণক্যের কঠোর-কোমল রূপটি এখানে ফুটে উঠেছে।

৩



বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল ; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল! ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য ভাব দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই অকালে তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রিয়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল—"দেখ, মার খাবি। এই বেলা ওঠ।"

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া-চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়িরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল,—কিন্তু সাহস হইল না। সে এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন, ইচ্ছা করিলেই এখনই তাহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আরও বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—'মারো ঠেলা হেঁইয়ো,—সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎ-ক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপর গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে তাহাকে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে-মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাখন গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধমগ্ন নৌকোর গলুইয়ের উপর বসিয়া চুপচাপ কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্তীদের বাড়ী কোথায় ?"

ফটিক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোথা !"

কিন্তু কোন্ দিকে যে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা ?"

সে বলিল, "জানিনে।" বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। ভদ্রলোক তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া ফটিকদেরই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

ফটিকের মা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা! তুমি কবে এলে?" বলিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুইটি সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে; তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পান নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-এক দিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে তাঁহার ভগিনী জানাইলেন, ফটিক তাঁহার হাড় জ্বালাতন করিতেছে।

শুনিয়া বিশ্বম্ভর বাবু প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিল, "যাব।"

"কবে যাব? কবে যাব?" করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশতঃ তাহার ছিপ-লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে ফটিক একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। ইহা ফটিককে সবচেয়ে বাজিত। মামা যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলিত। কিন্তু মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন,—"ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়গে যাও।" তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্ন-বাহুল্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবল তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা—অহর্নিশ তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। একদিন অনেক সাহসে তাহার মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মামা, মা'র কাছে কবে যাব ?"

মামা বলিয়াছিলেন, "ইস্কুলের ছুটি হোক।" কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনও ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। শিক্ষক তাহাকে মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া বলিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল। সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল, তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, অসুখ বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবেন, তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে, সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনের অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভর পুলিসে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরের নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ-চক্ষু লোহিতবর্ণ, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভর প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কর্মভোগ! দাও, ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মায়ের কাছে যাচ্ছিলাম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা, আমার ছুটি হইয়াছে কি?"

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

পরদিন দিনের বেলায় কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিত প্রদীপের পাশে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসীদের মত সুর করিয়া বলিতে লাগিল,—"এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ-এ-না।" কলিকাতায় আসিবার কালে কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, তখন দেখিয়াছিল খালাসীরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিতেছে। আজ যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময় ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ফটিকের শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনা, মানিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই উত্তর দিয়া কহিল, "আঁ।"

মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'ছুটি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ কর।

২। কেন ফটিক মামার বাড়ি যাবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল ? আবার কেনই বা সে মামাবাড়ি থেকে নিজের বাড়ি যাবার জন্য না বলে পালিয়েছিল ?

৩। 'আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'—এ কার উক্তি ? কখন সে এই উক্তি করেছিল ? বক্তার এই উক্তির মধ্য দিয়ে যে ভাব পরিস্ফুট হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'খেলা ভাঙিয়া গেল।'—কোন্ খেলার কথা এখানে বলা হয়েছে ? কে কে সে খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল ? খেলা ভেঙে গেল কেন ? তারপরে কি ঘটনা ঘটল ?

২। 'দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবল তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।'—কে দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়েছিল ? কেন তার গ্রামের কথা মনে পড়ত ? গ্রামে কি ছিল ? শেষ পর্যন্ত সে কি গ্রামে যেতে পেরেছিল ?

৩। 'ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না'; 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।'—এগুলি কার উক্তি ? কাকে লক্ষ্য করে ? এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে বক্তার কোন চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ শব্দ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :

প্রতীক্ষায়, বিচলিত, তত্ত্বজ্ঞানী, ভূমিসাৎ, অভিভূত, দুগ্রহ, অহর্নিশ, মুষলধারে, হতবুদ্ধিভাবে।

২। কোন্ পদ লেখ :

হৃষ্ট, গাম্ভীর্য, দৈবাৎ, দৈন্য, কাঁপিতেছে, আপাদমস্তক, নিরাশ, আঁ।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ :

তত্ত্বজ্ঞানী, অনতিবিলম্বে, গৃহাভিমুখে, অনাবশ্যক, অহর্নিশ, আপাদমস্তক।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

সঙ্কীর্ণ, সাধ্য, উদার, উদয়, গমন, সম্মত।

৫। লিঙ্গান্তর কর :

স্বামী, ভগিনী, মামী, চক্রবর্তী, দাদা, বালক, মানিক, মানব।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থানে পাঠের কথা বসাও :

(ক) নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ —— রূপান্তরিত হইবার —— পড়িয়াছিল।

(খ) ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার —— দেখিয়া কিছু —— হইয়া গেল।

(গ) গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতে মাখন তাহার ——, —— এবং —— সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

(ঘ) অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের —— তাহার ছিপ-লাটাই সমস্ত মাখনকে —— ভোগ দখল করিবার অধিকার দিয়া গেল।

(ঙ) ফটিক তাহার —— চক্ষু একবার —— করিয়া কড়িকাঠের দিকে —— তাকাইয়া কহিল, "মামা আমার —— হয়েছে কি?"

২। কার উক্তি বল :

(ক) দেখ্, মার খাবি। এই বেলা ওঠ্।

(খ) 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।'

(গ) চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়?

(ঘ) বই হারিয়ে ফেলেছি।

(ঙ) আমি তোমায় মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।

———

তোমার খাঁচায় যে বনের পাখিকে জোর করে রেখে বড়ো করা যায় না তাই এখানে দেখানো হয়েছে ফটিকের মাধ্যমে,



সরস্বতী কুণ্ডী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** ২৪-পরগনা জেলায় ব্যারাকপুরের মুরারিপুকুর গ্রামে বিভূতিভূষণের (১৮৯৪—১৯৫০ খ্রীঃ) জন্ম। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'দেবযান', 'ইছামতী', 'আদর্শ হিন্দু-হোটেল' এবং 'দৃষ্টিপ্রদীপ' তাঁহার রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম।]

নাঢ়া-বইহার জরিপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখিবার জন্য, প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম—প্রান্তসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোন কোন স্থানে আরও বেশী। একটা গাছের ডালে ঘোড়াটিকে বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমনভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে, বাহির হইতে আমাকে কেউ দেখিতে

পাইবে না। হাত তুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি এক প্রকারের বন্য লতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বন-সীমের মত সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের কাছে তুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না, কিন্তু কি ঘন, নিবিড় সুবাস সে ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে!

পূর্বেই বলিয়াছি, সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে, কত ধরনের, কত রঙ-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিখ, হরটীট, বন টিয়া, ফেজাণ্ট-ক্রো, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় রাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মানিকপাখী প্রভৃতি জলের পাখী—পাখীর কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাধ কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না। আমি শুইয়া শুইয়া দেখিতেছি, আমার চারিপাশে হাত দেড়-তুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালার লতায় বসিয়া কিচকিচ করিতেছে, আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় করে না; একটু হয়তো উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে, বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই একদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহলের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি, হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি বড় হরিণ নয়, হরিণ-শাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, তুজনেই নির্বাক নিস্পন্দ। আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে যেন মনুষ্য-শিশুর মত আগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না। আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণ-শিশু চকিত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তারপর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দূরে শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোন দিকে —কুণ্ডীর জলে জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে; একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখী তীরবর্তী হইয়া, এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া বসিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল। ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রঙ ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্ণের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেঁজি খানিক দূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পক্ষীর কাকলি ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই; আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্ক পত্র বা লতার টুকরার পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোনদিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন-গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশে এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল ছাড়াইয়া লতা উঠিয়াছে। এক ধরণের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোমরা লতা—সে লতা যে গাছের মাথায় উঠিবে, তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। এই সময় ভোমরা লতায় ফুল ফুটে। ছোট ছোট বন জুঁইয়ের মত সাদা ফুল কত বড় বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সরষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশী যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর, শরতের প্রথমে সকালবেলায় রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া ছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে পাশে —বড় বড় ময়নাকাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়া আছে—কাঁটাঘাস, শিলাখণ্ড, সবতাতেই রাশি রাশি শিউলি—আর্দ্র, ছায়াঘন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম। লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে। জ্যোৎস্না-রাত্রে-সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদী-স্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারী-লালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়াডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় চড়িয়া এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল, এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব নিস্তব্ধ—পূর্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু বাতাস—আমার সামনে বন ও পাহাড়-বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না—পরিপূর্ণ ছায়াহীন

জলের উপর পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না—ভোমরা লতার সাদা ফুলে ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে।

আর এক ধরনের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছে—ঝিঁ ঝি পোকার মতই। দুই-একটা পত্র পতনের শব্দ, খসখস করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নের শব্দ।

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না। কত গভীর রাত্রে আসে, কে জানে। আমি বেশী রাত পর্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি নাই। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। দুপুরে সরস্বতী কুণ্ডীর বনে প্রবেশ করে লেখক সেখানকার বনের যে বিচিত্র শোভা প্রত্যক্ষ করলেন, তা লেখকের বর্ণনা অনুসারে বিবৃত কর।

২। 'রোদ ক্রমশঃ রাঙ্গা হইয়া আসিল। ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে।'—রৌদ্রের তেজ কমে আসবার পর সরস্বতী কুণ্ডীর বনে লেখক যে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করলেন, তার বর্ণনা দাও।

৩। 'সরস্বতী কুণ্ডীর বনে পাখীর আড্ডা'—লেখকের বর্ণনা নিজ ভাষায় বিবৃত কর।

৪। 'সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম'—লেখক জ্যোৎস্না রাতে সরস্বতী কুণ্ডীকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার একটি ভাষাচিত্র আঁক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। '··· সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল, এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে।'—কোন্ দিনের কথা লেখক এখানে বলছেন? কি দৃশ্য দেখে লেখকের এরূপ মনে হল? দৃশ্যটি সংক্ষেপে লেখ।

২। 'কি নিভৃত শান্তি!'—কোথায়? কেন লেখক শান্তিকে 'নিভৃত' বলেছেন?

৩। দুজনেই নির্বাক নিস্পন্দ।'—কারা দুজনে? শেষ পর্যন্ত এই নিস্পন্দভাব কাটল কিভাবে?

৪। 'ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে!'—কোথাকার বনপুষ্প? কি পরিবেশে লেখক একথা বলেছেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লেখ এবং বাক্যে ব্যবহার কর ঃ

কলেবরে, কূজনে, সঞ্চরণ, নিস্পন্দ, বনস্পতি, মুখর, মগডালে, বনকুসুম, কাকলি, কৌমুদীস্নাত।

২। বচন পরিবর্তন কর ঃ

পত্ররাশি, বনদেবীরা, বড় বড় বনস্পতি, গাছে গাছে, তরঙ্গমালা, শৈলমালা, হরিণশিশু, পাখী, আমাকে, পুষ্প।

৩। পদান্তর কর ঃ

ঘর্মাক্ত, সুবাস, সঞ্চরণ, নিস্পন্দ, গম্ভীর, প্রবীণ, প্রস্ফুটিত, হৈমন্তী।

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ ঃ

খররৌদ্র, রৌদ্রদগ্ধ, প্রান্তর, ঘর্মাক্ত, সুবাস, অসঙ্কোচ, অবোধ, শৈলমালার, পাদদেশ, সুঘ্রাণ, কৌমুদীস্নাত।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শূন্যস্থানে নীচের কথাগুলি বসাও ঃ

বড় বড়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, থৈ-থৈ, ছায়াঘন, রাশি রাশি।

(ক) —— স্থান, (খ) —— শিউলি ফুল, (গ) —— জ্যোৎস্না, (ঘ) —— বনস্পতি, (ঙ) —— তরঙ্গমালা।

২। নীচের বিষয় এবং ব্যক্তি সম্পর্কে এক-একটি বাক্য লেখ ঃ

কাছারি, রাসপূর্ণিমা, বনদেবী, কুন্তো, সিন্নী, বনোয়ারীলাল।

লেখক দুপুরে সরস্বতী কুণ্ডে প্রবেশ করে সেখানকার বনের বিচিত্র শোভা ও জ্যোৎস্না-রা সরস্বতী প্রান্তে যেভাবে দেখেছেন তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এখানে।



এভারেস্ট বিজয়

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** অসাধারণ প্রাঞ্জল ও সুন্দর ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। শক্তিশালী এই লেখক শুধু প্রবন্ধাদি রচনাতেই নয়, বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।]

ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয়ের এই শেষ অভিযানে কর্নেল হাণ্টের নায়কত্বে তের জন নির্ধারিত পর্বত-আরোহী ছিলেন। এই তের জনের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়—তেনজিং, আর দু'জন হলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, বাকি সকলেই ইংরেজ। তাঁদের নাম হল কর্নেল হাণ্ট (নায়ক), মেজর উইলি, নইস, বুদিলো, গ্রেগরী, ব্যাণ্ড, ইভান্‌স, হিলারী, লাওয়য়ি, ওয়েস্টম্যাক্‌ট, ওয়ার্ড, পাফ্‌, স্টোবার্ট ও তেনজিং।

এভারেস্ট-অভিযানের যাত্রাকেন্দ্র হল—নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হন এবং এখান থেকেই কুলীদেরও সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মত এই অভিযানও 'আলপাইন ক্লাব' আর ইংলণ্ডের জগৎ-বিখ্যাত 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'-র যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিং-এর কাছে আবেদন-পত্র পৌঁছে গিয়েছিল। তেনজিংকে বাদ দিয়ে কোন এভারেস্ট অভিযানই গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সুইস-অভিযান থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তেনজিং অতি কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রীতিমত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এভারেস্টের আমন্ত্রণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেহ-মন থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেললেন। ঘরের শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটলেন মৃত্যুসঙ্কুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।

ভয়ঙ্কর যাঁদের ডাকে, কোন বন্ধনই আর তাঁদের রাখতে পারে না। তিনি কাঠমাণ্ডুতে এসে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং প্রথমেই কর্নেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করবার জন্যই এসেছেন, কিন্তু তাঁর একটা শর্ত আছে, সে শর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না। সে শর্ত হল— তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী বলে মেনে নিতে হবে এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তা হলে তাঁকে একাই এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর ব্রিটিশ এম্‌বেসীতে এই নিয়ে সভা বসল এবং সভায় স্থির হল, তেনজিং-এর শর্ত স্বীকার করা হবে। তেনজিং সানন্দে অভিযানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চারদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তার ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেলে, দু-দলে অভিযানকে ভাগ করা হল। প্রথম দলে রইল নয় জন অভিযাত্রী, একশো বাষট্টি জন ভারবাহী আর আঠারো জন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্নেল হাণ্ট, আরও তিনজন অভিযাত্রী, দু'শো জন ভারবাহী, আর দু'জন শেরপা। সমস্ত মালের ওজন হল সতেরো শো পাউণ্ড।

কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল নামচেবাজারের দিকে— কাঠমাণ্ডু থেকে একশো সত্তর মাইল দূর। এই নামচেবাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় আসল অভিযান। এই একশো সত্তর মাইল পথ

এত দুরূহ আর দুর্গম যে, অভিজ্ঞ নেপালী শেরপারা ছাড়া এই পথ দিয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। অন্য পথ দিয়ে অবশ্য নামচে-বাজারে পৌঁছানো যায়, কিন্তু তাতে সময় লাগে ঢের বেশি।

থায়াংবক থেকে শুরু হয়েছে এভারেস্টের তুষারক্ষেত্র। একটা বিরাট গ্লেসিয়ারের প্রান্তেই থায়াংবক। এইখানে সমস্ত অভিযান তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইল। কারণ এইখানে হিমালয়ের তুহিন-প্রকৃতির সঙ্গে অভিযাত্রী আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। তা ছাড়া এইখান থেকেই শুরু হয় পথ-ঘাট জরিপ করে দেখা। নতুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কি না, সামনে পথের অবস্থা কি রকম, পরবর্তী তাঁবু কোন্ জায়গায় স্থাপন করা হবে—সবই এইখান থেকেই নির্ধারিত হয়।

থায়াংবকে একটা বৌদ্ধ মঠ আছে। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, হিমালয়ের এই দূর-দুর্গমতার মধ্যে, এই অনন্ত তুষার রাজ্যেও সর্বত্র মঠ-মন্দির আছে, আর সেই মঠ ও মন্দিরে যুগ-যুগান্ত ধরে ইষ্টের আরাধনা চলেছে।

থায়াংবক মঠের বৌদ্ধ শ্রমণেরা অভিযাত্রীদের আশীর্বাদ করলেন।

থায়াংবক মঠের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এইখান থেকেই বাতাস খুব পাতলা হয়ে আসে। তাই এখানে কয়েকদিন বাস করে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য করে নিতে হয়।

আটাশে তেনজিং আর হিলারী সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সোজা এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে যত উঁচুতে পারেন, এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন, যাতে করে বিশ্রামের পর পরের দিন সকালবেলা তাঁরা শেষ তিনশো ফুট জয় করে ফিরে আসতে পারেন। এই উচ্চতায় তাঁদের সঙ্গে আর একজন তরুণ শেরপাও এসেছিল,—তার নাম আংগনিমা। তাঁদের দু'জনকে সাহায্য করবার জন্য গ্রেগরী, লাওয়ি আর আংগনিমাকে পাঠান হয়।

সাত নম্বর তাঁবু থেকে পথ প্রায় খাড়া সোজা ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে, প্রত্যেক পদে নিজের হাতে বরফ কেটে, পথ তৈরি করে, সেই খাড়া পথে উঠতে তাঁদের দুজনেরই মেরুদণ্ড যেন ভেঙে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, তাঁদের অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক কমে গিয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও একটা তাঁবু ফেলবার মতন সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। গত বছর তেনজিং সুইস অভিযাত্রীদের সঙ্গে এই পথেই এসেছিলেন, সেই সময় তিনি একটা জায়গা লক্ষ্য করেছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তেনজিং সেই জায়গা বার করলেন এবং সাতাশ হাজার আটশো ফুটে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হল।

এর আগে এত উঁচুতে আর কোনও তাঁবু ফেলা হয়নি। এই তাঁবুতে কোন রকমে একজন মানুষ ধরে। তাই থাকের মত করে তেনজিং আর হিলারী সেই ছোট্ট তাঁবুতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে যে সাহায্যকারী দল এসেছিল, তারা ফিরে গেল। তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার-নীড়ে কম্পিত বুকে রাত-প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।

উনত্রিশে ভোর ছ'টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্যে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ন'টার সময় তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন, সেখান থেকে এভারেস্টের মূল চূড়া হল আর আধ মাইল মাত্র! সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে অক্সিজেন নেবার মুখোশটা খুলে ফেললেন, দেখলেন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্সিজেন-যন্ত্রের দিকে চেয়ে তাঁরা ভীত হয়ে ওঠলেন। যেটুকু অক্সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয়, তা হলে চূড়ায় পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই ফুরিয়ে যাবে। তখন হিসেব করে তাঁরা অক্সিজেন মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য

নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগল। কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা সব অসুবিধের ওপর দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে সেই আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। সাড়ে এগারটার সময় তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হল।

এভারেস্টের চূড়ায় কে প্রথম উঠেছিলেন, এই নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়। এ-কথা নিঃসন্দেহ যে, তেনজিংই প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করেন।

চূড়ায় পদার্পণ করে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন—সঙ্গে যে চকোলেট আর বিস্কুট ছিল, তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করলেন!

তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। ভারতের পতাকা তাঁকে কোন ভারতীয় নেতা বা ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দেননি, তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোট্ট ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর দেওয়া ছোট্ট পতাকাটুকু রাখল ভারত-রাষ্ট্রের সম্মান।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'ভয়ঙ্কর যাঁদের ডাকে, কোন বন্ধনই আর তাঁদের ধরে রাখতে পারে না।'—কোন্ প্রসঙ্গে কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে? তাঁর সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করবার কারণ কি?

২। 'তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।'—কাদের কথা কোন্ প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে? যে পরিস্থিতিতে তাঁরা অক্সিজেনের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হন, তার বিশদ বিবরণ দাও।

৩। 'এভারেস্টের চূড়ায় কে প্রথম উঠেছিলেন, এ নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়।'—কে প্রথমে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন? কিভাবে? বাদানুবাদের প্রসঙ্গ কেন উঠেছিল?

৪। 'ঘরের শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটলেন মৃত্যুসঙ্কুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।'—কে, কোথায় ছুটলেন? সে-পথ মৃত্যুসঙ্কুল ও ভয়ঙ্কর কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'এই শেষ অভিযানে......তেরো জন নির্ধারিত পর্বত-আরোহী ছিলেন।' —কোন্ অভিযানের কথা এখানে বলা হয়েছে? তার নায়ক কে ছিলেন? তেরো জন পর্বত-আরোহীর নাম কি? অভিযানের যাত্রা-কেন্দ্র ছিল কোন্ স্থান? অভিযানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কারা?

২। 'সভায় স্থির হল, তেনজিং-এর শর্ত স্বীকার করা হবে।'—কোন্ সভার কথা এখানে বলা হয়েছে? তেনজিং-এর শর্ত কি ছিল?

৩। 'তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার-নীড়ে কম্পিত বুকে রাত-প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।'—তেনজিং আর হিলারী কে? কোন্ অভিযানে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন? কিসের জন্য তাঁরা রাত-প্রভাতের অপেক্ষা করছিলেন? 'কম্পিত বুকে' অপেক্ষা করার কারণ কি? তাঁদের প্রতীক্ষা কি সার্থক হয়েছিল?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর :

আত্মনিয়োগ, দুরূহ, দুর্গম, গ্লেসিয়ার, আরাধনা, তুষার-নীড়ে, দুর্জয়, অবিশ্রান্ত, পদার্পণ।

২। পদান্তর কর :

নায়কত্ব, নির্ধারিত, দুর্বল, অগ্রসর, আশ্চর্য, প্রয়োজনীয়, সাহায্য, ভয়ঙ্কর।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ :

বাদ, কঠিন, দুর্বল, বন্ধন, সক্ষম, অধিকার, স্থির, ভেতর, শুরু, দুর্গম, অভিজ্ঞ।

৪। নীচের বাক্যের বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন নির্ণয় কর :

(ক) চারদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তার ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

(খ) তখন হিসাব করে তাঁরা অক্‌সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন।

(গ) তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। টীকা লেখ :

(ক) আলপাইন ক্লাব, (খ) রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি,
(গ) থায়াংবক, (ঘ) নেপাল, (ঙ) ব্রিটিশ এমবেসী।

২। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) —— থেকে শুরু হয়েছে এভারেস্টের তুষারক্ষেত্র।

(খ) —— বাদ দিয়ে কোন এভারেস্ট অভিযানই গঠিত হতে পারে না।

(গ) —— যাঁদের ডাকে, কোন বন্ধনই আর তাঁদের ধরে রাখতে পারে না।

(ঘ) এই —— বাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় আসল অভিযান।

(ঙ) বন্ধুর দেওয়া সেই ছোট্ট —— রাখল ভারত-রাষ্ট্রের সম্মান।

পার্বত্যভিযানে যে পদে পদে বিঘ্ন, মৃত্যুর করাল মুখ ব্যাদান তাকে উপেক্ষা করে শেষ-পর্যন্ত কীভাবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে তেনজিং এবং হিলারী এভারেস্টকে জয় করলেন - তার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে, মানুষের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের রক্ত টগবগানো বিবরণ এখানে জীবন্ত হয়েছে যা শিশুদের অনুপ্রাণিত করবে,



স্বাধীন ভারত

অশোক গুহ

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** বরিশাল জেলার কাঁচাবালিয়া গ্রামে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে অশোক গুহের জন্ম। অনুবাদক হিসাবে ইনি সবিশেষ পরিচিত। ম্যাক্সিম গোর্কির অমর গ্রন্থ 'মা' এবং লাও চাঅ-র 'রিক্সাওয়ালা' গ্রন্থ দুটি অনুবাদ করিয়া ইনি রীতিমত খ্যাতি অর্জন করেন।]

আনন্দের ঢেউ বহিতেছে। অন্ধকারের যুগ শেষ হইল, আমরা আবার আলোর তীরে উপনীত। এই আলোর তীরে দাঁড়াইয়া মনে পড়ে আঁধারের বুকে মরণ-পণ সংগ্রামের কথা। মন চলিয়া যায় অতীতে। দুইশত বৎসর পূর্বের ইতিহাস চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

দীর্ঘ দুইশত বৎসরের প্রারম্ভে ফিরিয়া চলিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পঞ্চম পাদে তখন ইতিহাস। পলাশীর আম্র-কাননে সেদিন সূর্য বধির। বিদেশী বণিক্ লক্ষ্মীর পায়ে তার স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়া সে ডুবিল। অন্ধকারের যুগ শুরু হইল, আর তাহার গর্ভে বিদেশী সিংহাসন স্থাপিত হইল।

সে এক ভাঙনের যুগ। চারিদিকে তখন ভাঙন শুরু হইয়াছে। আর ইংরাজ তাহার কর্তা। অর্থনৈতিক প্রাকার সে ভাঙিয়া ফেলিল, ভাঙিল দেশের তাঁত-শিল্প আর চরকা। সমাজ-ব্যবস্থা তছনছ হইয়া গেল। ইংরাজ দেশের ধন লুটিয়া নিজের ভাণ্ডার ভরাইল, তাহারই

ফলে নিজের দেশে শিল্প-বিপ্লব। কিন্তু ভারত কি পাইল? নূতন কিছু ধ্বংসের উপর গড়িয়া তোলা তো ইংরাজের কাজ নয়। তাই ভারত ধ্বংসের স্তূপে গোঙাইতে লাগিল। তাহার পুরানো সমাজও তখন নাই, নূতনেরও আশা নাই, ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হতাশা সম্বল করিয়া সে চলিল। সেই হতাশার অন্ধকারে ধ্বংসের স্তূপে জীবনের বীজ কি হারাইয়া গেল?

সে বীজ অঙ্কুরের ফণা তুলিয়া উঠিল বিদ্বেষে। আসিল ওয়াহাবী আর ফকির-বিদ্রোহ। কিন্তু ইংরাজের রাজদণ্ডের আঘাতে বিপ্লবের সে অঙ্কুর বিনষ্ট হইল। একশত বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। একহস্ত পরিমিত যে মেঘ দেখা দিয়াছিল, সেই মেঘ এবার আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বিপ্লবের ঝড়ে কাঁপিয়া উঠিল বণিকের সিংহাসন। ইংরাজ তাহার নাম দিল বিদ্রোহ। কিন্তু স্বাধীনতার ইহাই প্রথম সংগ্রাম। সে সংগ্রাম একদিন শেষ হইল, কিন্তু স্বাধীনতা আসিল না। তবু দেশের ইতিহাসের পাতায় রক্তে কয়েকটি নাম লেখা হইল। ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া টোপী আর মঙ্গল পাণ্ডে অমর হইয়া রহিলেন। আর রহিল অসংখ্য জনগণের রক্তের স্বাক্ষর।

ইংরাজ প্রমাদ গণিল। শুধু সমর-সজ্জা দিয়া দেশকে তো অধীন করিয়া রাখা সম্ভব নহে। তাই সে নূতন সেনাদল গড়িয়া তুলিতে লাগিল। ইংরেজের কারখানায় তাহার ছাঁচে ঢালাই হইয়া তরুণদল বাহির হইয়া আসিল। চালে-চলনে, আচারে-ব্যবহারে তাহারা খাঁটি ইংরাজ। এই কালো ইংরাজেরা সরকারের বড় বড় পদ পাইল, ইংরাজ-শাসনের স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ দেশ জয় করিয়াছিল, এবার দেশের মন জয় করিল।

ইংরাজ দেশের মন জয় করিতে বাহির-বিশ্বের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল, সেই পথে আসিল নানা ভাবধারা। দেশে সে ধারা আনিলেন রামমোহন। মরা গাঙে নূতন জোয়ার আসিল, চেতনাও নূতন হইয়া দেখা দিল। নূতন সাহিত্য দেখা দিল, রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হইল, ইংরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভা। ইংরাজের কাছে আবেদন-

নিবেদনের থালা বহিয়া আনিলেন দেশের মানুষ। ইংরাজ সন্তুষ্ট হইয়া কিছু দিল, আসল জিনিসগুলি রাখিল নিজের হাতে। কিন্তু দেশের কালো ইংরাজরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মোহ-ভঙ্গ শুরু হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, ভিক্ষায় হইবে না। নিজেদের শক্তি-পরীক্ষায় নামিতে হইবে। সেই শক্তির পরীক্ষা শুরু হইল ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গে।

দেশ সেদিন কাঁদিল না, ইংরাজ প্রভুকে দূষিয়া নিরস্ত হইল না, সে গর্জিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে রব উঠিল, এ বিভাগ রদ করিতে হইবে। সরকারের সিদ্ধান্তকে টলাইতে হইবে। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ অগ্রণী হইয়া আসিলেন। দেশের মানুষ দেশাত্মবোধের রাখী-বন্ধনে ধরা দিল। সংগ্রাম শুরু হইল ; তাহার অস্ত্র বিদেশী বর্জন। দেশের একদল তরুণ কিন্তু এ অস্ত্র ব্যবহার করিতে রাজী হইলেন না। ইংরাজের উৎপীড়নের প্রত্যুত্তর তাঁহারা অস্ত্রমুখেই দিলেন। তাঁহাদের গুরু হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। ব্রিটিশ সিংহও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহে। সেও গর্জন করিয়া উঠিল। জেল ভরিয়া উঠিল ; ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদানের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। তাহার পর আসিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

দেখিতে দেখিতে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। এদেশের মানুষ যুদ্ধে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু দেশের মুক্তির আশা তেমনি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল। প্রতিদানে জুটিল অত্যাচার, অবিচার আর রাউলাট আইন। সম্পূর্ণরূপে মোহভঙ্গ হইল। দেশের মানুষ এবার নিজেদের ছকে ইতিহাস গড়িতে অগ্রণী হইলেন ; নেতারাও আর পিছনে থাকিতে পারিলেন না।

কংগ্রেসের মঞ্চে এবার আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন দেশের মানুষের দাবি ; তাহার পর নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন দাবি আদায়ের ভার। স্বরাজের দাবি অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেখা দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সে দাবি আরো শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

গান্ধীজী ডাক দিলেন। আসমুদ্র হিমাচল পৌঁছাইল সে ডাক। ইংরাজের ভেদনীতি যাঁহাদের এতদিন পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, সেই

মুসলমানেরাও এবার ছুটিয়া আসিলেন। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য এক হইল। সংগ্রাম নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। দেশের জ্ঞানী-গুণীরাও আর নিজেদের গৃহকোণে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছুটিয়া আসিলেন। পণ্ডিত মোতিলাল আসিলেন, সঙ্গে পুত্র জওহরলাল ; আসিলেন মওলানা মহম্মদ আলি আর শওকত আলি। ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া আসিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র। দেশের অন্তঃপুরেও সে ডাক পৌঁছাইল। কত মহিলা গৃহকোণ ছাড়িয়া আসিলেন। কবিতার কুঞ্জ ছাড়িয়া কবি সরোজিনী নাইডু রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিলেন।

দেশের তরুণদল তখনও ইংরাজী শিক্ষার কারখানায় ইংরাজি ছাঁচে ঢালাই হইতেছিল। দেশের ডাকে তাহারাও ছুটিয়া আসিল। চিত্তরঞ্জন তাহাদের লইয়া গড়িয়া তুলিলেন স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী। চাষী-মজুরের কাছেও ডাক পৌঁছাইল। কারখানায়, চা-বাগানে ধর্মঘট শুরু হইল। চাষীরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিল। চিত্তরঞ্জন তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—তিনি বঞ্চিত সর্বহারাদের বাদ দিয়া স্বরাজ চান না। আটানব্বই জন মানুষের স্বরাজই তাঁহার কাম্য।

সরকার প্রমাদ গণিল। জনগণের এই প্লাবনকে প্রতিরোধ করে এমন শক্তি কোথায়? তবু উৎপীড়ন চলিল, জেল ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত দেশবাসীকে জেলে পুরিবে—তেমন বিরাট জেল কোথায়?

গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিয়া দেশের অধিকার বজায় রাখিবার কথা বলিলেন। পরিবর্তনবাদী দল গড়িয়া উঠিল ; কিন্তু বিরোধী দল তাহা চাহিলেন না। শেষে চিত্তরঞ্জন জয়ী হইলেন। কংগ্রেস শাসন-পরিষদে প্রবেশ করিল। ইংরাজের শাসন-ব্যবস্থা তিনি নানাভাবে অচল করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। তিনি তাঁহার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া একদিন চলিয়া গেলেন। তাঁহার কাজের ভার এবার তুলিয়া লইলেন তাঁহারই যোগ্য শিষ্য সুভাষচন্দ্র।

আইন করিয়া ইংরাজ দেশের মানুষের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে, সেই অধিকার ফিরাইয়া আনিতে হইলে আইন ভাঙ্গিতে হইবে। লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, ইহা তৈরি করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাই গান্ধীজী ঠিক করিলেন, এই লবণ আইন সবার আগে ভাঙ্গিবেন।

তিনি একদিন আইন ভাঙ্গিতে বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে আইন ভাঙ্গার আয়োজন। ইংরাজ সরকার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুভাষচন্দ্র আগেই গ্রেফতার হইলেন ; জওহরলাল, গান্ধীজীও রেহাই পাইলেন না। কিন্তু সংগ্রাম থামিল না। পুলিস গুলি চালাইল, কারাগার ভরিয়া উঠিল, কিন্তু জনগণ দমিলেন না। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ইংরাজ চুক্তি করিল, আবার চুক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দেরি করিল না। তাহার পর একদিন বন্ধ হইয়া গেল সংগ্রাম, সরকার নেতাদের ছাড়িয়া দিল। ভারতের ক'টি প্রদেশে গড়িয়া উঠিল মন্ত্রিসভা। এবার গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অচ্ছুৎদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

আর এক বিশ্বযুদ্ধের মেঘ পশ্চিমের আকাশে তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। একদিন যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। কংগ্রেসের তখন ভাঙন ধরিয়াছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হইতে চলিয়া আসিয়া নূতন দল গড়িয়াছেন। তিনি তখন বিপ্লবের প্রচেষ্টায় ব্রতী। এই চেষ্টাই একদিন তাঁহাকে ঘরছাড়া করিল। কেহ জানিল না তিনি দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

মহাযুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিতেই কংগ্রেস আবার গান্ধীজীকে ফিরাইয়া আনিলেন। তিনি আসিয়াই ঘোষণা করিলেন, এই যুদ্ধে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই ভারতবর্ষ যোগ দিতে পারে, নচেৎ নহে। সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিল, কিন্তু ফল হইল না, গান্ধীজী আবার সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। এই সংগ্রামের ধ্বনি হইল 'ভারত ছাড়।'

গান্ধীজী বন্দী হইলেন, নেতারা বন্দী হইলেন, কিন্তু 'ভারত ছাড়' ধ্বনি মরিল না। হয় দেশ স্বাধীন করিব, না হয় মরিব—এই শপথ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নেতা নাই, প্রস্তুতি নাই—তবু বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সরকার গুলি চালাইল, সংঘবদ্ধ জনতার উপর বিমান হইতে বোমা ফেলিল। কিন্তু যখন গণদেবতা জাগিয়া উঠিয়াছে—স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়াছে, তখন তাহাকে কি অত্যাচারে রোধ করা যায়?

সারা ভারত জুড়িয়া যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন সুভাষচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি তখন জার্মানিতে ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গড়িয়া লইয়াছেন। এদিকে জাপান যুদ্ধে নামিয়াছে; বর্মা, মালয় তখন তাহার দখলে। সেখানে ভারতীয়দের কাছ হইতে তাঁহার ডাক আসিল—এশিয়ার মহান নেতা, এশিয়ায় আসিয়া মুক্তি-সংগ্রামের ভার লউন। সুভাষচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া গেলেন।

তাঁহার ডাকে শিশু, বৃদ্ধ যুবা ছুটিয়া আসিল, আসিল মেয়েরা। ভারতের মুক্তির জন্য গড়িয়া উঠিল এক সেনাবাহিনী, গড়িয়া উঠিল আজাদ হিন্দ্ সরকার; সুভাষচন্দ্র হইলেন তাহার নেতা।

নেতাজী সুভাষ এবার সেনাবাহিনী লইয়া ভারত আক্রমণ করিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে উড়িল স্বাধীন ভারতের পতাকা। 'দিল্লী চলো' ধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল, সেনাদল ছুটিয়া চলিল দিল্লীর পথে—স্বাধীনতার পথে।

কিন্তু হায়রে ভাগ্য! প্রবল বর্ষা নামিয়া আসিল পাহাড়ে জঙ্গলে। যানবাহন অচল। জাপান আত্মসমর্পণ করিল। নেতাজী সুভাষ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার আর সন্ধান মিলিল না। তবু দেশের মানুষ বিশ্বাস করে, তিনি বাঁচিয়া আছেন, আমাদের মধ্যে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

ইংরাজের সঙ্গে আবার আলাপ-আলোচনা চলিল। এবার ভারত দ্বি-খণ্ডিত হইয়া সৃষ্টি হইল দুই নূতন রাষ্ট্র—ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও

পাকিস্তান। জনগণকে লইয়া কংগ্রেস একদিন অকূল সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিল। অবশেষে তরী আসিয়া তীরে ভিড়িল।

দেশবন্ধু আগেই গত হইয়াছেন, নেতাজী নিখোঁজ, এবার মহাত্মাজীও চলিয়া গেলেন। তবে কি দেশের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে? না, তাঁহারা যে মৃত্যুহীন প্রাণ বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাণের সাড়া আজ দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে নিজের আসন করিয়া লইয়াছে। চারিদিকে যখন যুদ্ধ-নাগিনীরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তখন সে শুনাইতেছে মহাত্মার শান্তির ললিত বাণী। সে শান্তি চায়। সে শান্তি ফিরাইয়া আনিবে এই অশান্তির পৃথিবীতে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'পলাশীর আম্রকাননে সেদিন সূর্য ডুবিয়া গেল'—পলাশী কোথায়? সেখানকার আম্রকাননে কি ঘটনা ঘটেছিল? ঘটনাটির সঙ্গে সূর্য ডোবার তুলনা দেওয়া হয়েছে কেন?

২। 'বিপ্লবের ঝড়ে কাঁপিয়া উঠিল বণিকের সিংহাসন'—কোন ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে? বণিকের সিংহাসন বলতে কি বোঝাচ্ছে? সিংহাসন কেঁপে উঠল কেন?

৩। 'সেই শক্তি পরীক্ষা শুরু হইল ১৯০৫ সালে'—কোন্ শক্তি পরীক্ষার কথা এখানে বলা হয়েছে? ১৯০৫ সালে কি ঘটনা ঘটেছিল? ভারতের স্বাধীনতা লাভে সে ঘটনার গুরুত্ব কতটা?

৪। 'তিনি বাঁচিয়া আছেন, আমাদের মধ্যে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন'—কোন্ প্রসঙ্গে কার কথা এখানে বলা হয়েছে? দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর। কোন্ দেশের লোক বিশ্বাস করে তিনি ফিরে আসবেন?

৫। 'স্বাধীন ভারত' প্রবন্ধটি অবলম্বনে পলাশীর যুদ্ধ হতে শুরু করে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায়? সেখানে কোন্ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল? কে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী?

২। 'এই সংগ্রামের ধ্বনি হইল ভারত ছাড়।'—'ভারত ছাড়' আন্দোলন কিভাবে দেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করল?

৩। নীচের ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া টোপি, মঙ্গল পাণ্ডে, সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :

উজাড়, সম্বল, অঙ্কুর, দেশাত্মবোধ, মোহভঙ্গ, আবির্ভূত, অন্তঃপুরে, সর্বহারা, পরিবর্তনবাদী, সংঘবদ্ধ।

২। লিঙ্গান্তর কর :

নাগিনী, বৃদ্ধ, যুবা, নেতা।

৩। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ :

নির্খোজ, অকূল, অচ্ছুৎ, বজ্রকণ্ঠ, স্বর্ণভাণ্ডার, আম্রকানন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থানে বসাও :

দীর্ঘ —— বৎসরের প্রারম্ভে ফিরিয়া চলিয়াছি। —— শতাব্দীর পঞ্চম পাদে তখন ইতিহাস। —— আম্রকাননে সেদিন সূর্য বধির। বিদেশী —— —— পায়ে তাহার স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়া সে ডুবিল। —— যুগ শুরু হইল। আর তাহার গর্ভে —— সিংহাসন স্থাপিত হইল।

২। নীচের কথাগুলি কোন্ ব্যক্তির কথা :

ভারত ছাড়, দিল্লী চলো।

৩। এগুলির সম্বন্ধে এক-একটি বাক্য লেখ :

রাউলাট আইন, বঙ্গ-ভঙ্গ।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসটি এখানে দেওয়া হয়েছে।



[**লেখক-পরিচিতি ঃ** কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে কার্য করিলেও সুধীরঞ্জন দাশ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য বিদ্বজ্জন সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁহার 'স্মৃতিকথা'টি তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রবন্ধাদি রচনাতেও ইনি ছিলেন দক্ষ।]

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের অনেক সুসন্তান দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতালাভের জন্যে নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের স্তোকবাক্যে তাঁদের আস্থা একেবারেই চলে গিয়েছিল এবং তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সেদিনকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে প্রতি বৎসর কাগজে-কলমে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, তাতে কোনো কাজই হবে না। তাঁরা স্থির জেনেছিলেন যে, স্বাধীনতা একে অন্যকে দানস্বরূপ দিতে পারে না এবং ক্ষমতাদীপ্ত উদ্ধত রাজপুরুষের হাত থেকে তা স্বীয় বলপ্রয়োগে কেড়ে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন নানা জায়গায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল। পুণাতে এমনই একটি গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন বিপ্লবী বীর ঠাকুর সাহেব। ঐ সময় বরাবর শ্রীঅরবিন্দ বরোদাতে কাজ করছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ পুণার এই গুপ্তসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে এসেছিলেন বেয়েচেয়ে দেখতে যে এখানে কোনো গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা। সেই সময়ে তিনি

কয়েকটি যুবকর্মী বেছে নিয়ে মেদিনীপুরে বিপ্লবকেন্দ্র গঠন করেছিলেন। বাছাই-করা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি বরোদাতে ফিরে গেলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপরে বাংলাদেশের ভার দিয়ে। এই সময়েই তিনি নিজের মনকে পাকাপাকি রকমে প্রস্তুত করেছিলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মাহুতি দেবার জন্যে। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে তিনি তদীয় পত্নীকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা আলিপুর বোমার মামলার পর থেকে সর্বজনবিদিত হয়ে আছে। সেই চিঠিতে তিনি বিদেশী শাসন থেকে দেশোদ্ধারের নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ঠিক এই সময়ে ভগবানের নীরব নির্দেশে বাংলাদেশে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে টেনে এনে একেবারে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির মুখবিবরে ফেলে দিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের খেয়ালখুশি মতো বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গকে একটি আলাদা প্রদেশ বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেল। জনমতের প্রতি এরূপ অবজ্ঞায় দেশে আগুন জ্বলে উঠল। বঙ্গভঙ্গ রদ করে বাংলাদেশকে এক করতেই হবে—এই হল জনগণের দাবি। জনগণের কণ্ঠরোধ করবার জন্যে সরকার প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করলেন। ন্যায় বিচারের নামে কত বালক ছাত্রকে বেত মেরে অজ্ঞান করে দেওয়া হল, কত না উন্মুখচিত্ত যুবককে কারাগারের প্রাণহীন অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দিল।...হিংসাত্মক শাসনবিধির পাল্টা জবাবে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করতে হল দেশের লোকদের। দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টায় সাময়িক ব্যর্থতা যুবক-কর্মীদের টেনে নিয়ে গেল হিংস্র আচরণের দিকে। দেশের এই বিপ্লবময় পরিবেশের সুযোগ নিতে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহকর্মীদের।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দকে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে কলকাতায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের

অধ্যক্ষপদ নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হল। এবার তিনি এই দেশময় সংগ্রামে মনপ্রাণ নিয়োগ করলেন। প্রথমেই তিনি বাংলা ভাষায় 'যুগান্তর' নামে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সেই দৈনিকপত্রে শ্রীঅরবিন্দ জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধসমূহে দেশের যুবকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। দেশের বাস্তব দুর্দশার দিকে এবং তাদের সকলকে দেশসেবায় চরম স্বার্থত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে আহ্বান জানালেন। এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সরকার এরূপ কার্যপদ্ধতি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। অচিরে 'যুগান্তর' বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রীঅরবিন্দ তখন হাত মেলালেন প্রবীণ যোদ্ধা—বর্তমানে স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে। বিপিনবাবু তখন 'বন্দেমাতরম্' কাগজ সম্পাদনা করছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের লেখনী-নিঃসৃত জ্বালাময়ী ভাষা কারো চোখে ধূলো দিতে পারে না। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে সরকারী হুকুমে শ্রীঅরবিন্দকে ঐসব রাজদ্রোহী প্রবন্ধের রচয়িতা বলে গ্রেপ্তার করা হল। আদালতের মামলায় বিপিনবাবুর ডাক পড়ল—সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে যে, ঐসব আপত্তিজনক প্রবন্ধাদি শ্রীঅরবিন্দেরই লেখা। বলাই বাহুল্য যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক এবং একনিষ্ঠ দেশসেবক বিপিনবাবু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃত হলেন ; ফল হল এই যে, আদালত অবমাননার জন্যে বিপিনবাবুকে ছয় মাস কারাবরণ করতে হল এবং প্রমাণাভাবে শ্রীঅরবিন্দকে সেই দফায় মুক্তি দিতে হল।…

শ্রীঅরবিন্দের এই মুক্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে মজঃফরপুর শহরে স্থানীয় ক্রূরমতি জেলাশাসকের প্রাণহানির প্রচেষ্টায় একটি নিরপরাধ ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর সাথী প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলবার দিয়ে নিজেকে গুলি করে পুলিশের গ্রেপ্তার থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড হল এবং তিনি হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে নিজেকে কী

নির্ভীকভাবে আহুতি দিলেন সে-কথা নানা গানে দেশময় ছড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে তারিখে অতি প্রত্যুষে মাণিকতলার মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করে খানাতল্লাসী করে পুলিশ-বাহিনী কত না দেশী হাতবোমা, তলোয়ার, ছোরা ও রিভলবার বাজেয়াপ্ত করল। বারীন্দ্র ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক গুপ্তসমিতির সভ্য যাঁরা সে-সময় সে-বাগানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হল। সেইদিনই কলকাতার অন্য এক স্থান থেকে শ্রীঅরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মুখে মুখে খবর প্রচারিত হল এবং 'সন্ধ্যা' নামক সান্ধ্য কাগজের সে কি বিক্রি সেদিন সন্ধ্যায়!

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের পর শ্রী অরবিন্দ এবং অন্যান্য পঁয়ত্রিশজন যুবককে দায়রায় সোপর্দ করা হল। ভাগ্যের পরিহাস যে, সে বিচারের ভার গিয়ে পড়ল আলীপুরের তদানীন্তন সেসনস্ জজ মিঃ বীচক্র্যাফ্‌ট্ সাহেবের কাছে। এই বীচক্র্যাফ্‌ট্ সাহেব শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে এক সাথেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেছিলেন এবং পাসের তালিকায় শ্রীঅরবিন্দের কয়েক ধাপ নিচে তাঁর নাম বের হয়েছিল। মামলা চালু হল। তুমুল আইনের যুদ্ধ চলল দুই মহারথীর সঙ্গে। সরকার পক্ষের কৌঁসুলীদের অগ্রণী ছিলেন ইয়ার্ডলি নর্টন সাহেব; আর আসামীদের পক্ষে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লড়লেন তখনকার দিনের উদীয়মান ব্যবহারজীবী সি. আর. দাস এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। এই সি. আর. দাসই পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস নামে জগদ্বিখ্যাত দেশনেতা বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এই মামলা অনেক দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের মতন চলেছিল। আসামীদের এবং বিশেষ করে শ্রী অরবিন্দের যাতে দোষী বলে প্রাণদণ্ড হয়, তার জন্যে সরকার পক্ষ থেকে যাবতীয় কাণ্ডই করা হয়েছিল সরকারের সমস্ত আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে।...

অবশেষে একদিন মামলার শুনানী শেষ হল। আসামীদের পক্ষ থেকে সি. আর. দাসের শেষ সওয়াল-জবাবটি আইনের দিক থেকে একটি অপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব ভাষণ বলে বরাবরই স্বীকৃত থাকবে। তিনি অতি

বিচক্ষণতার সঙ্গে মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সরকারী কেসের যাবতীয় অসামঞ্জস্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যবহারজীবীর আইনের জ্ঞান ও সুনিপুণ বাগ্মিতার সঙ্গে বন্ধুপ্রীতি মিলিয়ে সে ভাষণ একটি পরম রমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সেই সওয়াল-জবাব শুধু সেই আদালতের বিচারকের কাছেই পেশ করা হয় নি, তা পৌঁছেছিল আরো অনেক উচ্চ আদালতের দেবতার পায়ের কাছে, যিনি অন্তরালে বসে সারা বিশ্বের নরনারীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

অবশেষে রায় দেবার দিন এল। ১৯০৯ সালের ৬ই মে তারিখে বীচক্র্যাফ্‌ট্ সাহেব রায় দিলেন। বারীন, উল্লাসকর এবং আরো অনেকের দোষ প্রমাণিত হয়েছে বলে তাঁদের দণ্ডবিধান হল। বারীন ও উল্লাসকরের হল প্রাণদণ্ড এবং অন্যান্য ক'জন যাঁরা দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নানা মেয়াদের সশ্রম জেলের ব্যবস্থা হল। শ্রীঅরবিন্দ এবং বাকিরা বেকসুর খালাস হলেন। পরে আপীলে হাইকোর্টে বারীন ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড নাকচ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছিল এবং অন্যান্য কয়েকজনের কারাদণ্ড কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রায় বের হয়ে যাবার পরই শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য—যাঁরা খালাস পেয়েছিলেন, তাঁরা সোজা চলে এসেছিলেন 'কালীমোহন আলয়' ভবনে যেখানে দাদাবাবু বাস করতেন। যাঁরা যুবক ছিলেন, তাঁরা সেদিন কি উৎসাহে বাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত বড় পুকুরে মুক্তিস্নান করেছিলেন, তা দেখবার মত হয়েছিল। কালীমোহন আলয়ের আকাশ-বাতাস তাঁদের হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। দুপুরবেলা খাবার পর সবাই বাড়ির পেছনের গাড়িবারান্দার উপরের বড় ঘরে বিশ্রাম করতে গেলেন। আমরা বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখান দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে তাদের দেখবার চেষ্টা করছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ সকলের মাঝখানে বসেছিলেন—মিতভাষী এবং চক্ষে সেই সুদূরনিবদ্ধ দৃষ্টি! তিনি যেন তার চারিপাশের পরিস্থিতি থেকে মনকে গুটিয়ে এনে একান্তভাবে আত্মস্থ হয়ে বসে ছিলেন। দুটি সহকর্মীর প্রাণদণ্ড আজ্ঞার নিষ্ঠুরতা যেন তাঁর মুখমণ্ডলকে দুঃখের কালিমায় লেপে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে নিচু গলায় দু-একটি

কথা দাদাবাবুর সঙ্গে বলছিলেন। কী মৃদু কণ্ঠস্বর! উত্তেজনার লেশমাত্র তাতে ছিল না। বিকেল হতে একে একে মুক্ত আসামীরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

সুদীর্ঘ দিন জেলে অবস্থানকালেই শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দের মনের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘনীভূত হয়ে আসছিল। জেলের ছোট্ট নোংরা ঘরে একা বসে বসে তিনি গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতেন। জেলখানার সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করেই হয়ত তিনি আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখেছিলেন তমসার পরপারে। ধীরে ধীরে তাঁর মনের প্রসার ও বিকাশ হচ্ছিল এবং তিনি নিশ্চয় করেই বুঝেছিলেন যে, কেবল বিপ্লবের নীতিতেই তাঁর আত্মিক ক্ষুধা মিটবে না এবং জীবনের চরম চরিতার্থতা ও পরিণতির জন্যে প্রয়োজন হবে একটি বৃহৎ জীবনের আদর্শধারা।

জেল থেকে খালাস পেয়ে তিনি 'কর্মযোগী' নামে একটি পত্রিকা বের করে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মর্মার্থ এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তারই ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কেবল কর্মযোগীর জীবনদর্শনেই তাঁর আত্মার ক্ষুধা মিটল না। তিনি চাইলেন পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে মিলিয়ে দিতে। ইংরেজ রাজত্বে বাস করা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠায়, কলকাতায় চার বছর থাকার পরে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফরাসি উপনিবেশ প্রথমে চন্দননগরে এবং পরে পণ্ডিচেরীতে চলে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। পণ্ডিচেরী বাসকালে তিনি একাই আপনার ধ্যান-ধারণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেন। পণ্ডিচেরীর আশ্রম থেকেই তিনি মাঝে মাঝে আশ্রমবাসীদের কাছে দর্শন দিতেন এবং দেশবাসীদের জন্যে তাঁর জীবনের জাগ্রত অভিজ্ঞতার কথা লিখে প্রচার করতেন। আগেই বলেছি, শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন ও আদর্শ সম্বন্ধে কোনো কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই। যে উচ্চ পর্যায়ে উঠলে এইরূপ ধীমান মনস্বীর স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সেই উচ্চ চূড়ায় আরোহণের কোনো সুযোগ ও সুবিধে আমার হয় নি। আমি তাঁকে খুব দূরে থেকে ভাসা-ভাসা-

রকমে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছি সেই বিরাট মহা-পুরুষের পায়ে, যিনি পরবর্তীকালে পরমাত্মার মধ্যে চির শান্তি, সুখ ও স্বর্গীয় আনন্দলাভ করে নিজের আশ্রমেই দেহরক্ষা করে গেছেন।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'ঠিক এই সময়ে'—এখানে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে? কি ঘটনা সে সময়ে ঘটল? সেই ঘটনার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ কিরূপে জড়িয়ে গেলেন? বিপ্লবকে আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে কেন?

২। 'সেই সওয়াল-জবাব শুধু সেই আদালতের বিচারকের কাছেই পেশ করা হয়নি, তা পৌঁছেছিল আরো অনেক উচ্চ আদালতের দেবতার পায়ের কাছে'—কোন্ সওয়াল জবাবের কথা এখানে বলা হয়েছে? কে এই সওয়াল পেশ করেন? আদালতের বিচারকটি কে ছিলেন? 'আরো অনেক উচ্চ আদালতের' বলতে কোন্ আদালতের কথা বলা হয়েছে? এই মামলার ফলাফল কি দাঁড়ায়?

৩। মুক্তিলাভের পর থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার কথা যা জান লেখ।

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ :

ধীরে ধীরে তাঁর মন……জীবনের আদর্শধারা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'প্রমাণাভাবে শ্রীঅরবিন্দকে সেই দফায় মুক্তি দিতে হল।'—কোন্ সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে? কেন পুলিশ অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেছিল? কেন তাঁকে মুক্তি দিতে হল?

২। বোমার মামলার আসামী হয়ে মুক্তিলাভের পর শ্রীঅরবিন্দ কার বাড়িতে আশ্রয় নেন? সেদিন তাঁকে কিরূপ দেখাচ্ছিল?

৩। পরবর্তীকালে তাঁর পরিবর্তন ঘটে কেন? পরে তিনি কোথায় আশ্রয় নেন?

৪। তাঁর শেষ জীবন কাটে কোথায়? কোথায় তাঁর তিরোধান ঘটে?

৫। অল্প কথায় এঁদের পরিচয় দাও:

বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, সি. আর. দাশ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ:

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর:

লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তদানীন্তন, উদীয়মান, দ্বীপান্তর, মুখরিত, মর্মার্থ, আধ্যাত্মিক, পরমাত্মা, ধীমান।

২। পদান্তর কর:

বৈপ্লবিক, বিচক্ষণতা, সম্মানিত, নিষ্ঠুরতা, শ্রদ্ধা, সম্পাদকীয়, জ্বালাময়ী, দীক্ষিত, ব্যর্থতা, হিংসাত্মক।

৩। ব্যাসবাক্য-সহ সমাস লেখ:

সর্বজনবিদিত, দুর্ভাগা, দেশোদ্ধার, যুগান্তর, অস্বীকৃত, মহারথী, অসামঞ্জস্য, অশ্রুতপূর্ব, দিনব্যাপী।

৪। লিঙ্গান্তর কর:

বীর, বিপ্লবী, মহান, সম্পাদক, অনুগামী, বড়লাট, লর্ড, অধ্যক্ষ, প্রবীণ, সাক্ষী।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১। গীতা ও উপনিষদ—এ দুটি কি? এতে কি আছে?

২। শূন্যস্থানে কথা বসাও:

(ক) —— খ্রীস্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন খেয়ালখুশি মতো বাংলাদেশকে দু'ভাগে ভাগ করেন।

(খ) —— খ্রীস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ নিয়ে বাংলাদেশে ফেরেন।

(গ) —— খ্রীস্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসু সরকারের হাতে ধরা পড়েন।

(ঘ) —— খ্রীস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হয়।

(ঙ) —— খ্রীস্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলার রায় বের হয়।

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা-দীক্ষা, বৈপ্লবিক কার্যাবলী-
জীবন-সাধনা-মতাদর্শ এখানে আলোচনা করা হয়েছে,



[**লেখক-পরিচিতি ঃ** বিনয় ঘোষের খ্যাতি মূলতঃ গবেষক হিসাবে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি-বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি বিস্তর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 'কালপেঁচা' ছদ্মনামেও ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।]

প্রাচীন যুগ থেকে প্রায় মধ্যযুগের প্রান্ত পর্যন্ত ইতিহাসে বাঙালীর বাণিজ্যিক কৃতিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ কুলবৃত্তিগত বাণিজ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বর্ধমান জেলার গলসী থানার অধীন মল্লসারুল গ্রামে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দের অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্তযুগের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনে এই অঞ্চলের তদানীন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। যেমন বক্কতক বা বাকৃতার্ হিম দত্ত, বটবল্লকের ষষ্ঠী দত্ত, শ্রী দত্ত, গোধগ্রামের মহি দত্ত ও রাজ্য দত্ত। এই দত্ত-রা কারা? পশ্চিমবঙ্গের গন্ধবণিক্, তাম্বুলিবণিক্ প্রভৃতি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দত্ত'রা অন্যতম। এঁরা মনে হয় এই বণিক্ দত্তদেরই প্রাচীন পূর্বপুরুষ। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এঁরা এক-একটি অঞ্চলের বিশেষ অগ্রগণ্য

ব্যক্তি ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তির জন্য। বাংলাদেশের এই বণিক্-সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় বাণিজ্য করে প্রচুর বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। হাজার-বারোশ বছর পরেও এই বণিক্দের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে। উজানির ধনপতি-সদাগর 'গন্ধবণিক্ জাতি বিদিত অবনী।' 'বিদিত অবনী' কথা থেকে বোঝা যায় বাঙালী বণিক্রা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশেও বাণিজ্য করতে যেতেন। উজানি নগরে ছিল ধনপতির বাস। অজয় নদের তীরে, বর্ধমানের উজানি-কোগ্রাম এই উজানি নগর। কেবল ধনপতি সদাগরের উজানি নয়, চাঁদ সদাগরের চম্পক নগরও এই অঞ্চলে। খুল্লনার পাত্র-নির্বাচন প্রসঙ্গে বণিক্দের যে-সব নাম ও বসতির উল্লেখ আছে, তা এই চম্পক-নগরের চাঁদ সদাগর, বর্ধমানের ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, সাঁতগাঁর বা সপ্তগ্রামের রাম দাঁ, বড়শুলের হরি দত্ত, ফতেপুরের রাম কুণ্ডু, কর্জনার হরি লাহা, ভাল্লকির সোম চন্দ। ধনপতি সদাগরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম হয়েছিল। তাঁদের নামধামের তালিকা আরও বিস্তৃত। সাত শত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতি সদাগরের গৃহে। যে সমস্ত গ্রাম থেকে তাঁরা এসেছিলেন, তার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম আজও স্বনামে বর্তমান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে দামোদর-অজয়-দ্বারকেশ্বর-সরস্বতী প্রভৃতি নদ-নদীর তীরে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত। আশ্চর্য হল, এইসব অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে আজও দেখা যায় বণিক্-সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি সর্বাধিক। গ্রামে পা দিলেই এই অঞ্চলে আজও সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী, বড় বড় অট্টালিকাবহুল যে-সব পাড়া দেখা যায়, সেগুলি প্রধানতঃ বণিক-সম্প্রদায়ের পাড়া।

বাণিজ্য বাংলার বণিক্দের কুলবৃত্তি। এই কুলবৃত্তির ঐতিহ্য বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালী বণিক্রা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় নয় শুধু, কলকাতা শহরেও আঠার শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালী

বণিক-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। কলকাতা শহরে বাঙালী শেঠ বসাক প্রভৃতি তন্তুবণিক্‌দের ইতিহাস এবং তাম্বুলি প্রভৃতি অন্যান্য বণিক্‌-সম্প্রদায়ের ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য হ'ল, উনিশ শতকে তো নয়ই, বিশ শতকেও বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙালী বণিক্‌-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ কেউ দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন ব'লে জানা যায় না। কুলবৃত্তিগত বাণিজ্যের সীমা তাঁরা হয়তো শাখা-প্রশাখায় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন ক'রে ধনতান্ত্রিক যুগের প্রকৃত শিল্পোদ্‌যোগীর মতো আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হননি! কেন হননি, তা বাস্তবিকই ভাববার বিষয়। স্বাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠার উপযোগী পর্যাপ্ত মূলধন সঞ্চয় করেছেন এরকম ব্যবসায়ীর অভাব নেই এঁদের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এঁরা বাণিজ্যমুখী হ'লেও স্বাধীন শিল্পমুখী হননি? কেন এঁরা প্রসিদ্ধ 'ব্যবসায়ী' হ'তে চান, 'শিল্পপতি' হ'তে চান না? তার অন্যতম কারণ মনে হয়, বেচা-কেনার বাণিজ্যে মুনাফার যে নিশ্চিন্ততা আছে, শিল্পোদ্যমে তা নেই। রক্ষণশীল মন নিশ্চিন্ততার আশ্রয়ে ডানা গুটিয়ে থাকতে চায়, গতিশীল মনের মতো অবাধে ডানা বিস্তার করতে চায় না অনিশ্চিতের সন্ধানে। শিল্পোদ্‌যোগী পুরুষের মন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন ও কৃতিত্বকামী! বাঙালী বণিক্‌-সম্প্রদায় যেমন কুলবৃত্তিগত রক্ষণশীলতা শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারেন নি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বাঙালী যাঁরা বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁরাও বেশিদূর পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন নি!

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'ধনপতি সদাগরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম হয়েছিল',—কোন্ প্রসঙ্গে কিসের পরিচয় দিতে লেখক এই উক্তি করেন ? 'সদাগর' বলতে কাদের বোঝায় ? ধনপতি সদাগর কে ?

২। শিল্পোদ্যোগী পুরুষের মন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ও কৃতিত্বকামী'—কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এই উক্তি করেছেন ? লেখকের মতে প্রকৃত শিল্পোদ্যোগী হতে গেলে কি কি গুণ থাকা উচিত ? বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা কেন শিল্পপতি হতে পারেননি ?

৩। বাণিজ্যমুখী হলেও বাঙালী ব্যবসায়ীরা শিল্পমুখী হন নাই কেন—এ বিষয়ে লেখকের যুক্তি ও তোমার মতামত লেখ।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লেখ ঃ

রক্ষণশীল মন নিশ্চিন্ততার...... অনিশ্চিতের সন্ধানে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীন গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে উল্লিখিত গণ্যমান্য কয়েকজন বণিকের নাম কর।

২। খুল্লনা কে ? তাঁর পাত্র-নির্বাচন-প্রসঙ্গে কোন্ কোন্ বাঙ্গালী বণিকের নাম উঠেছিল ?

৩। ধনপতি সদাগর কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন ? তাঁর বিষয় কি জান ?

৪। টীকা লেখ ঃ

চাঁদ সদাগর, সপ্তগ্রাম, তাম্রফলক, মঙ্গলকাব্য।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

ঐতিহ্য, দুঃসাহসিক, লঙ্ঘন, মূলধন, রক্ষণশীল, অভিযাত্রী, পদার্পণ, প্রতিপত্তি অগ্রগণ্য, ঐতিহাসিক।

২। পদ পরিবর্তন কর ঃ

প্রাধান্য, দুঃসাহসিক, লঙ্ঘন, উপযোগী, নিশ্চিন্ততা, রক্ষণশীলতা, বিচরণ, বাণিজ্যিক, বিত্ত, ঐতিহাসিক।

৩। ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখ :

অক্ষুণ্ণ, দুঃসাহসিক, বাণিজ্যমুখী, অবাধে, বন্ধনমুক্ত, বিচরণ, স্পষ্ট।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

প্রাচীন, প্রান্ত, সুস্পষ্ট, অক্ষুণ্ণ, সীমা, বন্ধন, অবাধে, রক্ষণশীল।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

বাণিজ্য বাংলার বণিকদের ——। এই কুলবৃত্তির —— বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালী বণিকরা —— রেখে চলেছেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় নয় শুধু, —— শহরেও আঠার শতক থেকে —— শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত —— বাঙালী বণিক্-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়।

২। এদের অল্প কথায় পরিচয় দাও :

অজয়, দামোদর, সপ্তগ্রাম, চণ্ডীমঙ্গল।

প্রাচীন যুগ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়-ভাগ পর্যন্ত ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী বণিকদের প্রাধান্য বর্ণনা করে যেন তাঁরা শিল্পোদ্যমী হতে পারেন তাই আলোচনা করা হয়েছে এখানে,



লেখক-পরিচিতিঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ইনি দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইনি কারাবরণ করেন। ইঁহার রচিত 'কাব্যলোক' নামক অলঙ্কার গ্রন্থটি বিখ্যাত। 'গল্পে উপনিষদ' ইঁহার রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।]

বড় সাধ ছিল হিমালয় দেখিব। ভারতের মানচিত্র দেখিয়া সেই যে হিমালয়কে দেখিলাম—কালো রেখাশ্রেণী তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম কই? তাহার পর যতই দিন গিয়াছে, ততই সে দেবভূমি হিমালয়কে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া চলিয়াছে। বাল্যের সেই আকাঙ্ক্ষা প্রথম কতকটা পূর্ণ হইল দার্জিলিং ভ্রমণ করিয়া।

১৩৩২ সন, বৈশাখ মাসে একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইয়া প্রথম দার্জিলিং যাইতে পারিয়াছিলাম।

পথের বর্ণনা কিছু দিব না, সে নিস্তব্ধ গিরিরাজকে দেখিলে 'দার্জিলিং-হিমালয়ান' রেলপথের বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

তখন বৈশাখের শেষ। পথে গাড়িতে অসহ্য গরম বোধ হইতেছিল—সারারাত্রি একটুও ঘুমাইতে পারিলাম না। শিলিগুড়িতে আসিয়া

নামিতেই কিন্তু কেমন শীত বোধ হইতে লাগিল। অনেকেই কিছু গরম পোশাক পরিয়া লইলেন। এখানে প্রভাতে বিশ্রাম ও জলযোগ সারিয়া 'দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে'র গাড়িতে চড়িলাম। ছোট ছোট গাড়ি, প্রায় কলিকাতার ট্রামের মত, গতিও প্রায় একরূপ, কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি ইঞ্জিন তাহাকে উপরে ঠেলিতে লাগিল। বুঝিলাম সমতলভূমি হইতে এবার পর্বতারোহণ শুরু হইয়াছে। গাড়ি যথাসম্ভব ধীরগতিতে দুই ইঞ্জিনের সাহায্যে হাঁপাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। উপলপূর্ণ শুষ্ক মহানন্দা পার হইয়া আমরা প্রবেশ করিলাম অনন্ত অরণ্যশ্রেণীর মধ্যে। ইহাই হিমালয়ের তরাই। অতি দীর্ঘ অথচ তীরগতির ন্যায় সরল, বিশাল শালবৃক্ষ, আরও কত বৃক্ষ পাতায় পাতায়, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি করিয়া রহিয়াছে। অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী লইয়া এক-একটি অরণ্য, অনন্ত অরণ্যশ্রেণী লইয়া এক-একটি পর্বত, এইরূপ যেন অনন্ত পর্বতশ্রেণী চলিয়াছে। এখনও তাহার আরম্ভ দেখা যায়—ভারতের উত্তর সীমান্তে, কিন্তু শেষে তাহাও লুপ্ত হইয়া আসিল।

কি কৌশলেই ইঞ্জিনিয়ার পর্বতের উপর দিয়া লৌহ-বর্ত্ম নির্মাণ করিয়াছেন। গাড়ি কোথাও পর্বতের ঠিক প্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। নিম্নে চাহিলে মনে হয়—সহস্র হস্ত নিচে এখনই পড়িয়া গিয়া আরোহীসহ গাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কোথাও পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া, কোথাও মহাসর্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া, কোথাও নীড়ত্যাগী বিহঙ্গের মত ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া, কোথাও বা একবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ উঠানামা করিয়া গাড়ি সমতলভূমি হইতে ৭০০০ ফিট ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল।

কার্সিয়াং-এ উঠিয়া বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল। দূরে চির-তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গমালার প্রথম দর্শন লাভ করিলাম। সে যে কি আনন্দ, মনে করিলে আজিও অঙ্গে পুলক উঠে। অলক্ষ্যে কণ্ঠ হইতে বাহির হইল ভারতমাতার বন্দনাগীত—"অম্বরচুম্বিত-ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার-কিরিটিনী।"

ভাল করিয়া গরম পোশাক পরিয়া উপরে ঐ পর্বতমালা এবং নিম্নে সূর্য-কিরণ-বিচিত্রিত মেঘপুঞ্জের শোভা দেখিতে দেখিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অল্প পূর্বে দার্জিলিং-এর পূর্ববর্তী ঘুম স্টেশনে পৌঁছিলাম। প্রথমে কোথায় আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই কি মেঘলোক? এই কি ইন্দ্রলোক? পুঞ্জ পুঞ্জ ধবল বাষ্পে বিশ্ব ঢাকিয়া গিয়াছে। বিশ হাত দূরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহার মধ্যেও সব অস্পষ্ট। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মেঘ-বাষ্প উদরস্থ হইতে লাগিল, জামা-কাপড়ের উপরে শিশিরকণার মত বাষ্পকণা জমিতে লাগিল। গাড়ির ভিতরে বাহিরে সর্বত্র এই মেঘ। বুঝিলাম, নূতন লোকে আসিয়াছি বটে। এখান হইতে আর মাত্র তিন মাইল দূরে দার্জিলিং শহর। সন্ধ্যার পর বৈদ্যুতিক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিলেও শুভ্র মেঘস্তর ভেদ করিয়া তাহার শোভা আমাদের চোখে বেশি পড়িল না। স্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, নেপালী ও ভুটিয়া মেয়ে-কুলীর ভিড়। বাহিরে অতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ ভুটিয়া রিক্‌শাওয়ালা রিক্‌শা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক মণ বোঝা পর্যন্ত মেয়ে-কুলীরাও কপালে দড়ি লাগাইয়া পিঠে ঝুলাইয়া চলিল। একজন সম্মুখে ও দুইজন পশ্চাতে রিক্‌শা টানিয়া ও ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমরা লাসা-ভিলায় উঠিলাম। প্রসিদ্ধ পর্যটক রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সেই যুগে সর্বপ্রথম তিব্বত ভ্রমণ করিয়া তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই বাড়ি 'লাসা-ভিলা' বলিয়া খ্যাত। ঐ রাত্রিতেও উত্তেজনাবশে ভাল ঘুম হইল না। পশ্চাতে 'বাতাসিয়া'র মধ্যে নিস্তব্ধ নিশীথে বাতাসের ভয়াবহ গর্জন শুনিয়া বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। ইহাই যদি স্বাভাবিক অবস্থা হয়, তবে ঝড়ের অবস্থা কি!

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই উত্তর দিকের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুকে বিশ্বাস হইল না। মেঘমুক্ত নির্মল প্রভাতখানি! সূর্য উঠে নাই বটে, কিন্তু চারিদিক পরিষ্কার। ঐ কি হিমালয় পর্বত? ঐ কি কাঞ্চনজঙ্ঘা, পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চ শৃঙ্গ (২৮,১৪৬ ফিট উচ্চ)? ঐ কি তাহার পশ্চিমে কাব্‌রু (২৪,০০২

ফিট), জুনো (২৫,২৯৪ ফিট)? ঐ কি পূর্বে নরসিং (১৯,১৩০), পাণ্ডিম্ (২২,০১০)? এই কি মন্ত্রী ও পর্ষদ পরিবেষ্টিত রাজাধিরাজ আপন ধবল মহিমায় বিরাজমান? অথবা বিভূতি-ভূষিত মহেশ্বর রজত-গিরিনিভ কান্তি লইয়া অনুচরগণসহ আবির্ভূত হইয়াছেন? দেখিতে দেখিতে অরুণ-কিরণ তুষারকিরীটে পতিত হইয়া সোনার কান্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে সম্রাট কাঞ্চনজঙ্ঘার ও পরে পার্ষদগণের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে সোনার বিদ্যুৎ ক্ষণেকের তরে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ছুটিতে লাগিল, যেন মুহূর্তের মধ্যে সোনার ভাষায় প্রকৃতির সঙ্গে কি কথা হইয়া গেল! মুহূর্ত পরেই সব শেষ! পাদদেশে সঞ্চিত ধবল মেঘসমুদ্র সূর্যের দীপ্ততে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। মধ্যে দেবদারু বনের শ্যামকান্তির অসিত বিস্তার! আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করিলাম।

পরে হিমালয়ের অনেক শোভা দেখিয়াছি। সিঞ্চল গিরিশ্রেণীতে শার্দুলগিরির (Tiger Hill, ৮০০০ ফিট) শীর্ষে উঠিয়া গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণী দেখিয়াছি। ১১,৯২৯ ফিট উর্ধ্বে সান্‌ডাক্ ফু শিখরে উঠিয়া পৃথিবীর অতুলনীয় দৃশ্য দেখিয়াছি—দেখিয়াছি, একদিকে নেপাল-সীমান্ত, অপর দিকে সিকিম-সীমান্ত ; সম্মুখে তিব্বত, পশ্চাতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ, দূরে গৌরীশঙ্কর (২৯,০০১ ফিট), মাকালু, (২৭,৭৯০ ফিট), ধবলগিরি, একদিকে জুনো, কাব্‌রু, কাঞ্চনজঙ্ঘা ; অদূরে যোজনব্যাপী সুগন্ধি দেবদারু বন ; আর রোডোডেনড্রন ফুলের অনন্ত বর্ণবাহার ; তুষারপাত হওয়ায় পদতলে ধরণী শুভ্র হইয়াছে। মধ্যে নির্ঝরিণীর কলঝংকারে স্তব্ধ অরণ্যানী ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, জটাজুট-শোভিত মুনিগণের ন্যায় দীর্ঘ শৈবাল সমাচ্ছাদিত বৃদ্ধ বৃক্ষের শাখায় বাঙলা দেশের কোকিল ও বউ-কথা-কও ডাকিতেছে ; দক্ষিণে দূরে অনতিদূরে সমভূমির বক্ষ চিরিয়া অনন্ত রজত রেখার ন্যায় গণ্ডকী, কুশী, মহানন্দা হিমালয় হইতে নামিয়া ভারতকে পবিত্র করিবার জন্য ছুটিয়াছে …কিন্তু দার্জিলিং-এ প্রথম প্রভাতখানি আমার মনে যে ছবি আঁকিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এ যেন বিধাতার পরম আশীর্বাদ!

দার্জিলিং শহরে ও সন্নিকটে বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। দার্জিলিং বাজার, অবজার্ভেটরি হিল বা মহাকাল পর্বত, জলাপাহাড় (সৈন্য-নিবাস), মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, লেবং (ঘোড়দৌড়ের মাঠ), ঘুমগুম্ফা প্রভৃতি অনেক বর্ণনীয় স্থান আছে। কিন্তু আজ পর্বতরাজ হিমালয়ের অপূর্ব মহিমা, গৌরব ও গাম্ভীর্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমার কেবল মনে পড়িতেছে শ্রীভগবানের সেই উক্তি—"আমি পর্বতগণের মধ্যে হিমালয়। পর্বতগণের মধ্যে হিমালয়েই আমার মহিমা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকটিত।"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'আমি আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করিলাম'—কি দেখে লেখক তাঁর ভাগ্যকে প্রশংসা করলেন ? যে স্থানের প্রসঙ্গে এই কথাটি এসেছে, সেখানকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গিরিশৃঙ্গের নাম কর।

২। দার্জিলিং যেতে হলে কোন রেলপথে যেতে হয় এবং যাবার পথে যে অরণ্যশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়, তার বর্ণনা লেখ।

৩। অলক্ষ্যে কণ্ঠ হইতে বাহির হইল ভারতমাতার বন্দনাগীত—অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষার-কিরিটিনী।'—কোন্ প্রবন্ধ থেকে এই অংশটি উৎকলিত ? উক্তিটি কার ? কি দেখে তাঁর কণ্ঠ থেকে এই কথা উচ্চারিত হয়েছিল ? হিমালয়কে কেন 'অম্বরচুম্বিত' বলা হয়েছে ? 'তুষার-কিরীটিনী' বলার কারণ কি ?

৪। লেখক হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে হিমালয়ের যে-সব সৌন্দর্যের কথা বলেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। লেখক কোন্ বছর দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন ?

২। 'লাসা ভিলা'—কার বাড়ি ?

৩। সান্‌ডাক্ ফু শিখরে উঠে লেখক কি অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখলেন ?

৪। দার্জিলিং শহর ও শহরের কাছাকাছি জায়গায় কি কি দ্রষ্টব্য স্থান আছে ?

দেবভূমি হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্য, অপূর্ব মহিমা গৌরব ও গাম্ভীর্য লেখকের চোখে যে ভাবে

৫। 'পর্বতগণের মধ্যে হিমালয়েই আমার মহিমা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকটিত।' —উক্তিটি কার? হিমালয়েই তাঁর মহিমা কেন প্রকটিত?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ

অপ্রত্যাশিত, গিরিরাজ, চিরতুষারাবৃত, অম্বরচুম্বিত, দৃষ্টিগোচর, শৈবাল-সমাচ্ছাদিত, প্রকটিত।

২। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ ঃ

দেবভূমি, অপ্রত্যাশিত, গিরিরাজ, লৌহবর্ত্ম, চিরতুষারাবৃত, অম্বরচুম্বিত, তুষার-কিরিটিনী, রাজাধিরাজ, বিভূতি-ভূষিত, রজতগিরিনিভ, শ্যামকান্তি, শৈবাল-সমাচ্ছাদিত।

৩। সমনাম শব্দ লেখ ঃ

মেঘ, সমুদ্র, পর্বত, অরুণ।

৪। লিঙ্গান্তর কর ঃ

মহেশ্বর, নির্ঝরিণী, অরণ্যানী, কুলি, অনুচর, আরোহী।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ডান পাশের শব্দ মিলিয়ে বাঁ-পাশের শব্দের বহুবচন লেখ ঃ

গাড়ি	শ্রেণী
মেঘ	মালা
শৃঙ্গ	পুঞ্জ
বৃক্ষ	গণ
পর্বত	গুলি
রেখা	সমূহ
অনুচর	প্রভৃতি

২। এদের বিষয় দু'চার কথা লেখ ঃ

বাতাসিয়া, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অবজারভেটরি হিল।

৩। ডান পাশের এবং বাঁ-পাশের গিরিশৃঙ্গগুলির উচ্চতা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। ঠিকমত সাজিয়ে লেখ ঃ

পাঙ্গিম	২৭,৭৯০ ফিট
জুনো	২৮,১৪৬ "
কাঞ্চনজঙ্ঘা	২৯,০০১ "
মাকালু	২৫,২৯৪ "
গৌরীশঙ্কর	২২,০১০ "

---

৬ উক্তি উদ্ভাসিত হয়েছে - তারই বিবরণ এখানে ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

॥ পঞ্চাংশ ॥



অন্নদার আত্মপরিচয়

ভারতচন্দ্র রায়

[**কবি-পরিচিতি ঃ** হুগলী জেলার অন্তর্গত হাওড়ার অদূরবর্তী আমতার নিকট ভূরশুট পরগণার মধ্যে পেঁড়ো গ্রামে ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে ভারতচন্দ্রের (১৭১২—১৭৬০ খ্রীঃ) জন্ম। পিতার নাম হরেন্দ্রনারায়ণ রায়। নদীয়ার তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করে। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের-ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥

অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনি ভাবে তারি ঘরে যাই ॥
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল ॥
যাঁর নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার ॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'বুঝহ ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি'—একথা কে, কাকে বলেছেন ? বক্তা নিজ পরিচয় কি দিলেন ?

২। 'ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার'—পাটনী কে ? 'পাটনী' কাদের বলে ? 'তাঁহারে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে ? তিনি কিভাবে পাটনীর কাছে নিজের আত্মপরিচয় দিলেন ?

৩। "গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥"

—বক্তা কে ? 'সতা' কথার অর্থ কি ? সে কার জীবন-স্বরূপা ? বক্তা কেন গঙ্গাকে তাঁর স্বামীর 'শিরোমনি' হিসাবে অভিহিত

করেছেন ? বক্তার এই উক্তির মধ্যে কোন্ অন্তর্নিহিত অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে তা ব্যাখ্যা কর।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর :

(ক) অতি-বড় বৃদ্ধ……কপালে আগুন ॥

(খ) যাঁর নামে পার করে……তাঁহারে করে পার ॥

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'—কার সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে ? 'কপালে আগুন' কথাগুলি দ্বারা কি বোঝান হয়েছে ?

২। 'পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম'—অন্নপূর্ণার অপর নাম কি ? পিতামহ কে ?

৩। 'কণ্ঠভরা বিষ'—কার ? কেন ? বিষ ও বিশ—কথা দুটির অর্থ কি ?

৪। 'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল'—কুলীনের সঙ্গে কোন্দলের কি সম্পর্ক ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :

কুলবধূ, ফের-ফার, সবিশেষ, নিপুণ, দ্বন্দ্ব, অহর্নিশ, ভব-পারাবার।

২। লিঙ্গান্তর কর :

পাটনী, ঈশ্বরী স্বামী, নারী, বৃদ্ধ, পিতামহ, সতা।

৩। তিনটি করে সমনাম শব্দ লেখ :

গঙ্গা, বাসা, সমুদ্র, ভব।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। নীচের অর্থগুলি ঠিক শব্দের পাশে বসাও :

গরল, উঠিয়া বস, নারী, গলার আওয়াজ, পারি না, কুড়ি।

বামা—, স্বর—, নারি—, বিষ—, বিশ—, চড়—।

২। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক) কু-কথায় পঞ্চমুখ—বিষ।

(খ) কোন গুণ নাই তার কপালে—।

(গ) গঙ্গা নামে সতা তার—এমনি।

(ঘ) ভাল ভাগ্য—তাঁহারে করে পার।

এখানে শ্লেষ অলংকারের ব্যঞ্জনায় অন্নদা তাঁর আত্মপরিচয় দান করেছেন, দেবীর কাছে ঈশ্বরীর মাধ্যমে প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে বাঙালীর বাঙালির মনো বাসনা প্রকাশিত



বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**কবি-পরিচিতি ঃ** যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪—১৮৭৩ খ্রীঃ) জন্ম। প্রথমে ইংরাজীতে কাব্য লিখিলেও পরবর্তীকালে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নাটক ও কাব্য রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হন। তাঁহার রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতা'ই বাংলা ভাষার প্রথম সনেট। কবির রচিত তিনটি উৎকৃষ্ট কাব্য হইল—'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'।]

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি',
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি' কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'।
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা ! মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি' অজ্ঞান তুই যারে ফিরি' ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণি-জালে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণি-জালে'—মাতৃভাষাকে কবি কেন 'খনি হিসাবে আখ্যাত করেছেন? কবির কাছে এই খনি কিরূপে মণিপূর্ণ বলে প্রতিভাত হল?

২। 'পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ'—কে কোথায় কেন ভ্রমণ করেছিলেন? তাতে কি তিনি সফল হয়েছিলেন?

৩। ব্যাখ্যা কর : 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।'

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'মাতৃকোষে রতনের রাজি'—মাতৃকোষ কাকে, কেন বলা হয়েছে? রত্ন বলতে কি বুঝলে?

২। 'অবরেণ্যে বরি'—অবরেণ্য কোন্‌টি? কি কারণে তাকে অবরেণ্য বলা হয়েছে?

৩। 'হে বঙ্গ!'—কাকে বলা হয়েছে? তার ভাণ্ডার কিসে পূর্ণ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ :
মত্ত, আচরি, পরিহরি, মজিনু, কমল-কানন।

২। গদ্যে কিরূপ হবে লেখ :
করিনু, আচরি, মজিনু, কেলিনু, কয়ে দিলা।

৩। প্রতিটি পদের পরিচয় দাও :
কেলিনু, শৈবালে, ভুলি, কমল-কানন।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :
অনিদ্রা, অনাহার, অবরেণ্য, বিফল, অবোধ, সুখ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :
(ক) —— লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ।
(খ) স্বপ্নে তব —— ক'য়ে দিলা পরে।
(গ) যা —— অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে।
(ঘ) হে বঙ্গ! —— তব বিবিধ রতন।

২। বন্ধনীর মধ্যে যে অর্থটি ঠিক, তার তলায় দাগ দাও :
বিবিধ—(অনেক, নানারকম, বহু, বিচিত্র)
পরিহরি—(পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে, গিলে নিয়ে)
কায়—(মন, ধর্ম, অর্থ, শরীর)
কমল—(নরম, পদ্ম, সুখাদ্য, শক্ত)

ইংরেজি সাহিত্যে হতাশ্য মধুসূদন বাংলাভাষার প্রতি সুগভীর আকর্ষণে সাড়া দিয়েছিলেন, কবির সেই আলোলোড়ে প্রায়শ্চিত্ত এখানে ফুটে উঠেছে।



[কবি-পরিচিতি ঃ অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে কবি নবীনচন্দ্রের (১৮৪৬—১৯০৯ খ্রীঃ) জন্ম হয়। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' কবির রচিত তিনটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। ইহা ছাড়া 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যে নতুন রচনারীতির প্রবর্তন করিয়া তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়া ওঠেন। এই কাব্যটিও কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।]

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি অন্যমন।
শুক্ল মেঘখণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দ লহরীপূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে ; হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শরে, লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিল প্রথম ;
অধীর হইল প্রাণ বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল।
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত,
চাহি' ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।

কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান !
উভয়ে উভয়-পানে নীরবে চাহিয়া কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ।
আসি' দেবদত্ত কহে, "কুমার ! এ হংস মম
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিল ধীরে, "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই, তাহা কোন শাস্ত্রবলে,
যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইবে না ?
হত নহে, এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।
তোমার তো আছে প্রাণ পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
লও তুমি শাক্য-রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত, বিস্মিত-চিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্তি করুণার !
ফিরিল নীরবে গৃহে ; উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটি পাঠ করে সিদ্ধার্থের করুণার কথা যা জানা যায়, তা নিজ ভাষায় প্রকাশ কর।

২। "তোমার তো আছে প্রাণ পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ নাকি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?"

—কোন্ কবিতায় এই অংশটি আছে? কার লেখা? কে কাকে কখন এই কথা বলেছিল? পাখীর প্রসঙ্গ এখানে এল কেন? বক্তা কেন পাখীর ব্যথায় ব্যথিত? এই ঘটনা থেকে বক্তার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন্ ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ভবিষ্যতে তিনি কি নামে পরিচিত হন?

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লেখ :

শাক্য-পুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত, বিস্মিত-চিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্তি করুণার!

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। আহত পাখিটি কখন সিদ্ধার্থের কোলে পড়েছিল?
২। কে পাখিটিকে কি ভাবে আহত করেছিল?
৩। সিদ্ধার্থ কেন পাখিটিকে ফেরত দিতে চাইলেন না?
৪। কি যুক্তিতে দেবদত্ত হংসটিকে ফেরত চাইলেন?
৫। পাখিটি ফেরত না দেওয়ায় সিদ্ধার্থের চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
৬। "অধীর হইল প্রাণ বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য-প্রস্রবণ।"

—উক্তিটি কার সম্বন্ধে? তাঁর প্রাণ কেন অধীর হয়েছিল? 'করুণার পুণ্য-প্রস্রবণ' কেন তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হল? 'প্রথম' কথাটি বলার পিছনে যুক্তি কি?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :
লহরীপূর্ণ, কুমার-অঙ্কে, বিশ্বব্যাপী, প্রতিদান, বিমোহিত, বিকল, বিস্মিত-চিত্ত, কলকণ্ঠে।
২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : পুরোত্থান, উদ্ধার, নীরব।
৩। সমাস নির্ণয় কর : নিরজন, পুরোত্থান, লহরীপূর্ণ, বিশ্বব্যাপী, বিমোহিত, বিস্মিত-চিত্ত।
৪। তিনটি করে সমশব্দ লেখ : কানন, বিহঙ্গ, জননী ও গগন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কবিতার কথা শূন্যস্থানে বসাও ঃ

(ক) একটি —— হইল পতন।

(খ) মম শরে হয়ে হত পড়েছে ——।

(গ) হত নহে, এই হংস —— কেবল।

(ঘ) দেখিল কুমার নহে —— করুণার।

২। মোটা কথাগুলির নির্দেশ মত উত্তর লেখ ঃ

(ক) **আনন্দ, অধীর, ক্ষুদ্র**—এদের বিপরীত শব্দ লেখ।

(খ) **কুমার, মুগ্ধা, পুত্র**—এদের বিপরীত লিঙ্গ কি হবে?

(গ) **'অঙ্ক'**—শব্দটিকে যত রকম অর্থে প্রকাশ করতে পার, তা বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাও।

শৈশবের সামান্য ঘটনার মধ্যেই বড় হওয়ার চিহ্ন বর্তমান থাকে, সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের মধ্যে একটি রাজহংসকে রেখে শিশু সিদ্ধার্থের গৌতম হয়ে ওঠার ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে



মা আমার

কামিনী রায়

[**কবি-পরিচিতি ঃ** অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার বাসণ্ডা গ্রামে কবি কামিনী রায়ের (১৮৬৪—১৯৩৩ খ্রীঃ) জন্ম। বাংলার মহিলা-কবিগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'আলো ও ছায়া'। অপরাপর কাব্যগুলির মধ্যে 'দীপ ও ধূপ', 'পৌরাণিকী', 'নির্মাল্য' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।]

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি-অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাই আর,
দুঃখিনী জনমভূমি—মা আমার মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়ামাঝে,
আপনারে অপরের নিয়োজিতে তব কাজে :
ছোট বড় সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার।
অতীতের কথা কহি', বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অবিরাম,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার।
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। কবিতাটির ভাবার্থ নিজ ভাষায় লেখ।

২। 'অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়ামাঝে'—কোন্ কবিতার অংশ? কার উক্তি? বক্তা নিজ হিয়ায় কোন্ 'অনল' পুষতে চেয়েছেন? তাতে বক্তার লাভ কি? 'অনল' শব্দটির তিনটি সমশব্দ লেখ।

৩। ব্যাখ্যা লেখ :

"মরিব তোমার কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'হাসি-অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন'—কে বিসর্জন দিয়েছেন? কোন্ দিন বিসর্জন দিয়েছেন?

২। 'মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার'—মা কে? কেন তাঁকে মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে? বক্তা কে? তাঁর জন্য বক্তা মরতে চাইছেন কেন?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :
বিসর্জন, অবসর, নিয়োজিতে, অবিরাম, বিষাদময়, কলঙ্কভার।

২। পদান্তর কর : বিসর্জন, অবিরাম, বিষাদময়, কলঙ্কভার, প্রাণ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। ডান পাশের কথাগুলি বাম পাশের বিপরীত শব্দ হিসাবে বসাও :

হাসি	আহ্বান
বিসর্জন	যাক
ছোট	অতীত
সুখ	বড়
বর্তমান	কান্না
থাক	দুঃখ

২। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক) হাসিবার……অবসর নাই আর।
(খ) আপনারে……নিয়োজিতে তব কাজে।
(গ) সে কথাও……না, হৃদয়ে জপিব তার।
(ঘ) নহিলে……এ জীবন কেবা ধরে?
(ঙ) গাহি যদি কোন গান,……তবে অবিরাম।

দেশজননীর প্রতি কবির শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হয়েছে এখানে।



শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

[**কবি-পরিচিতি ঃ** অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০—১৯১৯ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইলেও ইঁহার গীতি-কবিতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। **'এষা'** তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। অপরাপর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে **'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি'** ও **'শঙ্খ'** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।]

সারাদিন একখানি জল-ভরা কাল মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ,
বসিয়া গবাক্ষ ধারে সারাদিন আছি চেয়ে
জীবনের আজি অবকাশ।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে তরুগুলি হেলে দোলে
ফলগুলি পড়েছে খসিয়া
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে ঝুলি'
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই পথে লোকজন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজে মাঠ বন হ'তে ফড়িং লাফায়ে উঠে
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক ঝাড়িয়া পাখা ডাকিয়া ফটিক জল,
বেড়া'তেছে উড়িয়া আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কম্পিত বাতাসে ভাসে,
ঢাকা ধরা শ্যাম কুশ-কাশে।

দীঘিটি গিয়াছে ভ'রে সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে
কানায় কানায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ঘায় বায়ু-ঘায় পড়িতেছে নুয়ে নুয়ে
আধ-ফোটা কুমুদ-কমল।
তীরে নারিকেল-মূলে থল্ থল্ করে জল,
ডাহুক-ডাহুকী কূলে ডাকে ;
শ্রেণী দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে
পাড়ে পাড়ে চকাচকী বসে আছে দুটি দুটি
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;
ক্বচিৎ বা গ্রাম্যবধূ শূন্য কুম্ভ লয়ে কাঁখে
তরুশ্রেণী-তল দিয়া আসে।
ক্বচিৎ অশ্বথ-তলে ভিজিছে একটি গাভী,
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ-মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।
মাঠে নব শ্যাম ক্ষেতে কচি ধানগাছগুলি
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে ;
কোলেতে লুটিছে জল টল্ মল্ থল্ থল্
বুকে বায়ু থর থর নাচে,
সুদূরে মাঠের শেষে জ'মে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয় !
ঘরে ব'সে মুড়ি দিয়া গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্রসহ
কত দুর্যোগের কথা কয় !
চেয়ে আছি শূন্য পানে কোন কাজ হাতে নাই,
কোন কাজে নাহি বসে মন,
তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই, দেহ আছে মন নাই
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। কবির 'শ্রাবণে' কবিতা পড়ে শ্রাবণ মাসের একটি কথাচিত্র অঙ্কিত কর।

২। 'তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই দেহ আছে মন নাই,
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।'

—কবিতাংশটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? কার লেখা? কবির চোখে তন্দ্রা থাকা সত্ত্বেও ঘুম নেই কেন? 'দেহ আছে মন নাই'—কেন এরূপ অবস্থায় কবি পৌঁছিয়েছেন? ধরাকে স্বপনরূপে কবির মনে হবার কারণ কি? স্বপন অস্ফূট কেন?

৩। ব্যাখ্যা লেখ :

সুদূর মাঠের শেষে জ'মে আছে অন্ধকার
কোথা যেন হতেছে প্রলয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'শ্রাবণে' কবিতাটিতে কতগুলি প্রাণীর উল্লেখ আছে? তাদের নাম লেখ।

২। এই কবিতায় কোন্ কোন্ ফুলের নাম পাও?

৩। 'বসিয়া গবাক্ষ ধারে'—কবি কি কথা ভাবছেন?

৪। কে ফটিক জল বলছে? 'ভিজে মাঠ বন হ'তে'—কে লাফিয়ে উঠছে এবং জলায় বসে কে ডাক ছাড়ছে?

৫। কারা মেঘের কোলে ভাসে? 'তরুশ্রেণী-তল দিয়া'—কারা আসে?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর :
গবাক্ষ, অবকাশ, ভেকদল, কম্পিত, মরালী, বলাকা, ক্বচিৎ, দুর্যোগ, অস্ফুট।

২। সমাস নির্ণয় কর :
অস্ফুট, তরুশ্রেণীতল, চকাচকী, জল-ভরা, লোকজন।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

দুর্যোগ, গবাক্ষ।

৪। মুমূর্ষু, প্রলয়, স্বপন, ক্বচিৎ, নিদ্রা, কম্পিত—এগুলি কোন্‌টি কোন্ পদ, নির্ণয় কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক) —— কাল মেঘ ; (খ) —— হেলে দোলে ;

(গ) ঢাকা ধরা —— কুশ-কাশে ; (ঘ) —— হাসি সম ;

(ঙ) জমে আছে —— ; (চ) দেহ আছে —— নেই।

২। অন্ত্য অক্ষর দিয়ে অপর একটি করে শব্দ লেখ :

নিদ্রা ; গ্রীবা ; দেহ ; মন ; হাসি।

কবি শ্রাবণ মাসের একটি রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন এখানে,



নগরলক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**কবি-পরিচিতি ঃ** রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১ খ্রীঃ) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতের মহাকবিদের অন্যতম। ইনি ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। বাংলা ভাষা ও ছন্দকে এত রূপে ও এত ভঙ্গিতে তিনি কর্ষণ করিয়াছেন যে, তাঁহার হাতে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সকল দৈন্য ঘুচিয়াছে। 'সোনার তরী', 'নৈবেদ্য', 'ক্ষণিকা', 'কথা ও কাহিনী' কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। 'গোরা', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাস ও 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকের জন্যও কবি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।]

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা!"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট
কহিল সে কর জুড়ি', "ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই, স্বামী।"

কহিল সামন্ত জয়সেন,
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ !"

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
"কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—
আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত
রাজকর যোগানো কঠিন ;
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী 'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদ-সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মুক্তকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বরিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা
নগরীতে অন্ন বিলাইবার,
আমি আজি লইলাম ভার।"

বিস্ময় নামিল সবে শুনি,—
"ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরু কাজ,
কী আছে তোমার কহ আজ।"

কহিল সে নমি সবা কাছে,
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া,
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। নগরলক্ষ্মী কবিতার সারকথা নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।'

—উক্তিটি কার? তাঁর পরিচয় কি? কাকে তিনি একথা বললেন? কোন্ প্রসঙ্গে? কিভাবে তিনি সব সমস্যার সমাধান ঘটালেন? উদ্ধৃতি পংক্তি দুটির অর্থ বিশদভাবে বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি'।
—বুদ্ধ কে? কেন তাঁর আঁখি দুটি করুণ হল? আঁখির সঙ্গে সন্ধ্যাতারার তুলনা দেওয়া হয়েছে কেন?

২। 'আমি আজি লইলাম ভার'—বক্তা কে? কার প্রতি তার এই প্রকার উক্তি? কিসের ভার নেবার কথা বলছে? নিজের প্রতিশ্রুতি সে পালন করল কিরূপে?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। নীচের শব্দগুলির অর্থ পরিস্ফুট কর এবং প্রতিটি শব্দের সাহায্যে একটি করে বাক্য রচনা কর :
লাঞ্জনম্রশিরে, অশ্রুপ্লুতা, ভিক্ষুণী।

২। পদ পরিবর্তন কর :
ক্ষুধার্ত, দগ্ধ, অক্ষম, নির্বাক, বিনয়।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :
মাথা, ক্ষমতা, কঠিন, অক্ষম, নির্বাক, গুরু, অক্ষয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক) "ক্ষুধিতেরে —— সেবা
তোমরা লইবে বল ——।"

(খ) "—— যোগানো কঠিন
হয়েছি —— দীনহীন।"

(গ) "ভিক্ষুণীর —— সুপ্রিয়া
তব —— লইল বরিয়া।"

২। নীচের শব্দ যুগলের অর্থ পার্থক্য লেখ :
মুক, মুখ ; সুতা, সুতা ; অন্ন, অন্য ; দিন, দীন।

অর্থের অধিকারী হলেই যে অপরের দুঃখ দূর করা যায় এ কথা ঠিক নয়। সেই দুঃখীর প্রতি সমবেদনা, সহানুভূতি, মমত্ববোধ, থাকলে দুঃখীর পাশে দাঁড়ানো যায়। প্রকৃত দরদী অর্থ না থাকলেও যে কীভাবে দুঃখ দূর করতে পারেন তা এখানে দেখানো হয়েছে।



নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[**কবি-পরিচিতি ঃ** বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রীঃ) প্রথমে কাব্যচর্চা শুরু করেন ইংরাজিতে, কিন্তু ইহার পরে তিনি 'হাসির গান' ও কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাটক লিখিয়া দ্রুত খ্যাতিলাভ করেন। এই হাসির গানগুলি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রধানতঃ নাটক রচনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত জনপ্রিয় নাটকগুলির মধ্যে 'দুর্গাদাস', 'রাণা প্রতাপ', 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মেবার পতন' সমধিক উল্লেখযোগ্য।]

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা' করেই হ'ক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, "আ-হা-হা কর কি নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে উদ্ধার এই দেশ ?'
তখনে সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা, বেশ !"

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা ?
নন্দ বলিল, "ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক।"
তখন সকলে বলিল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, তা বটে, ঠিক !"

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন—
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা নন্দলাল।"

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি।
নন্দ বলিল, "আ-হা-হা ! কর কী, কর কী, ছাড়ো না ছাই,
কী হবে দেশের, গলা টিপুনীতে আমি যদি মারা যাই !
বল ক' বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা !"
তখন সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা, বাহবা, বাহা !"

নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি ;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ি চাপা-পড়া ভয় !
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল, "ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল !"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'বাঁচার আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক',—উক্তিটি কার ? কার প্রতি সে এই উক্তি করেছে ? কেন সে 'বাঁচাটাকে' প্রয়োজনীয় বলে মনে করছে ? যে কবিতা থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি কোন্ ধরনের কবিতা ?

২। 'স্বদেশের তরে, যা করেই হ'ক রাখিবেই সে জীবন'—কার সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছে ? নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য সে যা করেছে, কবির ভাষা অনুযায়ী তা বিবৃত কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। 'নন্দলাল' কবিতার নন্দলাল কি ব্যক্তিবিশেষ, নাকি নামটি কোন রূপক ?

২। নন্দলালের ভাই বলতে কাদের বোঝাচ্ছে ?

৩। সাহেবকে নন্দলাল কি করেছিল ? তার ফল কি হয়েছিল ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। বাক্যে ব্যবহার কর :

চিরকাল, জাহির, দশগুণ, বাহবা, টিপ্পনী ।

২। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক) নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—

— — — — — — — — — — —

(খ) নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তারে কেবা ?

— — — — — — — — — — —

(গ) নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি ।

— — — — — — — — — — —

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

যে কথাটি ঠিক তার তলায় দাগ দাও :

(ক) একদা নন্দলাল ভীষণ পণ করিল--

(১) করিব ভাইয়ের সেবা ।

(২) স্বদেশের তরে যা করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন ।

(খ) নন্দ সবে পদ্যে গদ্যে গালি দিল কিভাবে ?—

(১) দ্বিগুণ ঘুমিয়ে, (২) তিনগুণ লুচি খেয়ে, (৩) একখানা কাগজ বের করে ।

(গ) সাহেব নন্দের গলা টিপে ধরেছিল কেন ?—

(১) কাগজে একদা সাহেবকে গালি দিয়েছিল বলে ।

(২) নৌকা ফি-সন ডুবছে বলে ।

(৩) হাঁটতে সাপ, কুকুর আর গাড়িচাপা-পড়ার ভয়ে ।

উক্ত দেশপ্রেমের প্রতি কবির তীব্র বিদ্রূপ-
নিত হয়ে উঠেছে এখানে।



হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[**কবি-পরিচিতি :** বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে যতীন্দ্রনাথের (১৮৮৭—১৯৫৪ খ্রীঃ) জন্ম। তিনি ছিলেন বি. ই. উপাধিধারী ইঞ্জিনিয়ার, আর কোন বাঙ্গালী বোধহয় ঐরূপ শিক্ষা সত্ত্বেও এমন কবি-প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' এবং 'সায়ম্'।]

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট ;
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ,
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট
বেচা-কেনা সেরে বিকালবেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়ে পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে উঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।

হাটের দো-চালা মুদিল নয়ান
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি, বিদ্রূপ বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে'।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে
কেউ গেল খালি ফিরে'।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এ পারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি পরখের ছল—
বিকালবেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল
কত ক্রেতা-বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা !
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা ।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা !

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'হাট' কবিতাটি অবলম্বনে হাটের একটি বর্ণনা দাও। কবি কিভাবে মানব-জীবনের সঙ্গে হাটের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন ?

২। 'নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে ।'

—সন্ধ্যার অন্ধকার নামার পর থেকে হাটের অবস্থা কেমন হয়, 'হাট' কবিতাটি অবলম্বনে তার বর্ণনা দাও ।

৩। 'নূতন করিয়া……নাটের খেলা ।'

—কবিতাংশটি কোন্ কবিতা থেকে গৃহীত হয়েছে ? কবিতাটি কার রচনা ? এই অংশটিতে কবি কি বলতে চেয়েছেন তা নিজের কথায় বুঝিয়ে লেখ ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দিনমানে হাটের অবস্থা কিরূপ ?

২। নির্জন রাত্রিতে হাটের চেহারা কেমন ?

৩। 'নিত্য নাটের খেলা ।'—একথা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ? 'নাটের খেলা' বলতে কি বুঝ ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। শব্দযুগলের অর্থ-পার্থক্য লেখ :
দীপ, দ্বীপ ; জ্বলা, জলা ; কড়ি, করি ; বাঁধে, বাধে।

২। বাক্যে ব্যবহার কর :
শ্রেণীহারা, কোলাহল, বিদ্রূপ, আহ্বান, টানাটানি, হানাহানি, দিবসরাত্রি, উদার।

৩। শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও :

(ক)
নিশা নামে দূরে —— একা
ক্লান্ত —— পাথে ;
নদীর —— ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে —— শাখে।

(খ)
মাল ——, দর ——,
—— নিয়ে কত —— ;
—— করে কেউ নিল ভরে
কেউ গেল —— ফিরে।

———

অবলম্বন
গ্রাম্য হাটকে ~~অবলম্ব~~ করে ভবের হাটের
ছবি- সুন্দর- চিত্র- এখানে অঙ্কন হয়েছে।



আকিঞ্চন

কালিদাস রায়

[**কবি-পরিচিতি ঃ** বর্ধমান জেলায় কড়ুই গ্রামে কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯—১৯৭৫ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে কবি, শিক্ষক, সাহিত্য-সমালোচক এবং হাস্যরসিক ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুর ইঁহার পূর্বপুরুষ। 'পর্ণপুট', 'ঋতুমঙ্গল', 'ব্রজবেণু,' 'রসকদম্ব', 'বৈকালী' কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।]

দুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ-গান, উৎসবের কলতান
সারাদিন না পশে শ্রবণে।
যেথা নিত্য নাহি হেরি সতত আমারে ঘেরি
উল্লাসের চল-নৃত্য চলে ;
যেখানে সম্ভোগ-সুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে।
যেখানে ফোটে না ফুল, সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
গাহে না এমন মধু-গান,
চাঁদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে
নাচিয়া তুলে না কলতান।
সুখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ কাতর হেন
আর্তনাদ হায় পথে পথে !

সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসের ধিক্কার না হানে ;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
আমাদের উৎসবের পানে।
হয়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লতিকারা
সেথা যেন ভূমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে
ঋতুরাজ পাখা না গুটায়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। 'যেথানে আনন্দ গান.........পশে শ্রবণে।'
—কোন্ কবিতা থেকে অংশটি নেওয়া হয়েছে? কবিতাটি কে রচনা করেছেন? 'যেথানে' বলতে কবি কোন্ স্থানের কথা বলছেন? কবির মতে সে স্থানটি কেমন হওয়া উচিত?

২। 'যেন কাঙালিনী মেয়ে.........উৎসবের পানে।'
—কি প্রসঙ্গে কবি এই উক্তি করেছেন? উৎসব-প্রাঙ্গণে কাঙালিনী মেয়ে এলে কিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হয়? অনন্ত সুখময় জগতের অধিবাসী হওয়ার জন্য কবি কিরূপ পরিবেশ কামনা করছেন?

৩। কবিতাটির নাম আকিঞ্চন হল কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কবি কিভাবে দুঃখ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছেন?

২। কবি কোথায় নিয়ে গিয়ে সুখ দেবার কথা বলেছেন?

৩। 'উল্লাসের চল-নৃত্য', 'উল্লাসের ধিক্কার', 'গিরির মেয়ে'—কথাগুলির অর্থ লেখ।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। প্রতিশব্দ লেখ ঃ

ভুবন, বিহঙ্গ, চাঁদ, দয়াময়, নদী, তরু।

২। গদ্যরূপ লেখ :

হেরি, পশে, যেথা, হানে, হেন, রয়, সেথা।

৩। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

মেয়ে, কাঙালিনী, দয়াময়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। ঠিক অর্থটির তলায় দাগ দাও :

(ক) ঋতুরাজ—শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত।

(খ) দয়াময়—সন্তান, ঈশ্বর, পিতা।

(গ) গিরির মেয়ে—উমা, ভুমা, সোমা।

(ঘ) গবাক্ষ—জানালা, দরজা, চাঁদোয়া।

(ঙ) বিহঙ্গকুল—পক্ষীদল, জন্তুসকল, জীবগণ।

২। সম্ভোগ, ব্যঙ্গ, আর্তনাদ, উল্লাস—কথাগুলি বাক্যে ব্যবহার কর।

সুখ-দুঃখেতে চেয়ে ঈশ্বরের কাছে যে
প্রার্থনাটি করুণ অভিনব।



সঙ্কল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

[**কবি-পরিচিতি ঃ** বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—১৯৭৬ খ্রীঃ) জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। নজরুলই বাংলাদেশের প্রথম কবি, যাঁহার কবিতায় সামাজিক অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি আত্মবিস্মৃত একটি জাতিকে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবির বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সিন্ধুহিল্লোল', 'দোলনচাঁপা', 'বুলবুল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।]

থাকব না'ক বদ্ধ ঘরে দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ-দেশান্তরে
ছুটছে তা'রা কেমন ক'রে—
কিসের নেশায় কেমন ক'রে ম'রতেছে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন ক'রে বীর ডুবুরী সিন্ধু ছেঁচে মুক্তা আনে
কেমন ক'রে দুঃসাহাসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে;
জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন ক'রে আন্‌ছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টান্‌লে সাগর উথ্‌লে ওঠে জোয়ার-বানে।

কেমন ক'রে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে
কিসের অভিযানে মানুষ চল্‌ছে হিমালয়ের চুড়ে
তুহিন মেরু পার হয়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায় ;
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরে,
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে ।

রইব না'ক বদ্ধ খাঁচায়, দেখ্‌ব এ-সব ভুবন ঘুরে
আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারায়, সাগর জলে, পাহাড় চুড়ে
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশদিকেতে প'ড়ব লুটে,
পাতাল ফেড়ে নাম্‌ব নীচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে,
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। কবিতাটির নাম 'সঙ্কল্প' হল কেন ? কবি কি কি সঙ্কল্পের কথা কবিতায় বলেছেন ?

২। 'রইব না'ক বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এসব ভুবন ঘুরে'
—কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই উক্তিটি করেছেন ? কেন তিনি 'বদ্ধ খাঁচায়' থাকতে অনিচ্ছুক ? 'ভুবন' শব্দটির প্রতিশব্দ লেখ। ভুবন ঘুরে কবি কি কি দেখতে চাইছেন ?

৩। এই কবিতার বাণীগুলি একজন তরুণের বাণী—একথার স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। নীচের অংশগুলির অর্থ বুঝিয়ে লেখ :

(ক) কেমন করে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে।

(খ) শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।

(গ) বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

২। টীকা লেখ :

হিমালয়, সিন্ধু, লক্ষ্মী, ডুবুরী, চন্দ্রলোক।

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। গদ্যরূপ লেখ :

মরতেছে, ছেলে, মথ্‌লে, ফেড়ে, ফুঁড়ে।

২। প্রতিশব্দ লেখ :

যান, সিন্ধু, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, তারা।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। নীচের কথাগুলি উপযুক্ত শব্দের আগে বসাও :

বীর, ঢেউয়ের, তুহিন, চন্দ্রলোকের।

(ক) — মেরু, (খ) — লাখে লাখে, (গ) —ডুবুরী, (ঘ) — ঝুঁটি,
(ঙ) — অচিনপুরে।

২। পরের লাইনটি লেখ :

(ক) কিসের নেশায়…………লাখে-লাখে,
(খ) কেমন ক'রে আনছে………সিন্ধু-যানে,
(গ) পাতাল……… ফেড়ে আকাশ ফুঁড়ে।

অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখার এবং অলব্ধকে লাভ করার দুর্বার বাসনা মানুষের মধ্যে নিত্য বিরাজমান। কবি তারই বন্দনাগান করেছেন এখানে।



জীবন-ভিক্ষা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

[কবি-পরিচিতি ঃ ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে করুণানিধানের জন্ম হয়। অতি অল্প-বয়সেই তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ধানদূর্বা', 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'রবীন্দ্র আরতি' এবং 'শতনরী' নামক সংকলন-গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।]

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, তুলালে আগলি' বক্ষে,
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দরবিগলিত চক্ষে
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন,
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন ;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে।
"স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ মধুরসে-পরিষিক্ত ?
মুখ-চম্পকে মরুর বর্ণ
শুষ্ক অধর কমল-পর্ণ—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষ-বিন্দু-রিক্ত ?

"কোথা সে মাধুরী আধো আধো বোলে ? কুন্দ বৃন্ত ছিন্ন,
দন্তরুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে
ননীর পতল —

"অবনীর এই পদ্মবেদীতে হরিলে ত্রিতাপ দুঃখ,
যাত্রা করেছ—দুরগম পথ ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম।
দিয়ে তপোবল, মহানির্বাণ
কুমারে আমার করো প্রাণদান।"
লুটায় জননী বুদ্ধ চরণে, আলুথালু কেশ রুক্ষ·

কহেন বুদ্ধ, 'তনয় তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
থাকে যদি কোথা অশোকনিলয়;
ভিখ্ মাগি আনো সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা,
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে, "শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার,
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হরো জগতের বিরহ আঁধার দাও গো অমৃত দীক্ষা।"

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। 'জীবন-ভিক্ষা' কবিতাটির সারকথা নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'অবনীর এই পদ্মবেদীতে হরিলে ত্রিতাপ দুঃখ,
যাত্রা করেছ দুর্গম পথ ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম।'
—কে কার প্রতি এই উক্তি করেছে? কোন্ প্রসঙ্গে? 'অবনী' কি? অবনীকে পদ্মবেদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? ত্রিতাপ দুঃখ কি? কে এই দুঃখ হরণের চেষ্টা করেছিলেন? কেন তাঁর যাত্রাপথকে 'ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম' বলা হয়েছে?

৩। 'নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে! শিখাইলে শেষ শিক্ষা'—কে কাকে নিবেদন করল? 'শেষ শিক্ষা' বলতে কি বোঝাচ্ছে? বক্তা কিভাবে এই শিক্ষালাভ করল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ-শ্যেনের-পক্ষে'—কে, কখন, কাকে এই উক্তিটি করেছে? 'বিহগী' কে? 'শ্যেন' কি? শ্যেনের সঙ্গে মরণের তুলনা দেওয়া হয়েছে কেন?

২। 'লুটায় যুবতী বুদ্ধ চরণে আলুথালু কেশ রুক্ষ'—যুবতীটি কে? কেন সে বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়েছে? লুটিয়ে পড়বার আগে বুদ্ধদেবের কাছে সে কি জ্ঞাপন করেছে?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। টীকা লেখ :

(১) প্রাণের ইন্দু পীযুষ-বিন্দু-রিক্ত, (২) কুন্দবৃন্ত-ছিন্ন, (৩) পরাণ মৃণাল ভগ্ন, (৪) অমৃত দীক্ষা।

২। সমনাম শব্দ লেখ :

বিহগ, বুদ্ধ, অবনী, তনয়, নিলয়।

৩। সমাস লেখ : মরণ-শ্যেনের, স্তন-ক্ষীরধার, রসনা-প্রসূন, মুখ-চম্পক, বৃন্তছিন্ন, পদ্মবেদীতে, ক্ষুরধারসম।

"জীবমাত্রে মরিতে হবে"- এই সত্য মানুষ বুঝতে চায় না, বুদ্ধদেব কৌশলে কীভাবে সন্তানহারা মাকে এই শিক্ষা দিলেন তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এখানে,



বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

জীবনানন্দ দাশ

[**কবি-পরিচিতি ঃ** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ। বিখ্যাত মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাসী ইঁহার মাতা। জীবনানন্দ রচিত 'বনলতা সেন,' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ তিনটি বাংলা কাব্যসাহিত্যে অতি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯৫৪ সালে এক দুর্ঘটনায় কবির মৃত্যু হয়।]

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে—
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ ;
ফণিমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ঃ
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।”
—উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কবিতাটির রচয়িতা কে ? কবি বাংলার কি রূপ দেখেছেন ? কেন তিনি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে অনিচ্ছুক ?

২। মধুকর ডিঙা থেকে.........অপরূপ
রূপ দেখেছিলো.........
—কোন্ কবিতার অংশ ? কবি কে ? কবি কথাগুলির মধ্য দিয়ে যে ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

৩। টীকা লেখ ঃ
মধুকর ডিঙা, চাঁদ, বেহুলা, গাঙুড়, ইন্দ্র।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ‚অন্ধকারে জেগে উঠে’—কে কি দেখেছে ?
২। ‘বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিলো’—কে কি দেখেছিল ?
৩। ‘তাঁর কেঁদেছিল পায়’—কে বা কারা, কিসের মতো কার পায়ে কেন কেঁদেছিল ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ ঃ

১। পদ নির্ণয় কর ঃ
আর, তাই, বড়ো, নীল, ছিন্ন।

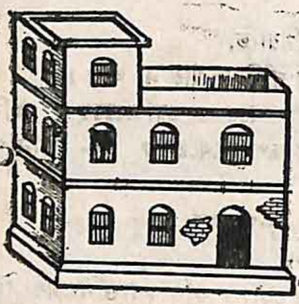
২। সাধু ভাষায় রূপান্তর কর ঃ
‘চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নীচে বসে আছে।

৩। স্থূলাক্ষর পদের কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ
(ক) বাংলারে **মুখ** আমি দেখিয়াছি।
(খ) **অন্ধকারে** জেগে উঠে।
(গ) মধুকর **ডিঙা থেকে** না জানি।

বিষয়াশ্রিত প্রশ্ন ঃ

১। আলোচ্য কবিতায় কোন্ কোন্ গাছ ও পাখির নাম আছে লেখ।
২। চাঁদ ও মধুকর ডিঙার কাহিনী কোন্ আখ্যান গ্রন্থে আছে ?
৩। ইন্দ্রের সভায় কে কেন নেচেছিল ?
৪। পরের লাইনটি লেখ ঃ
(ক) খুঁজিতে যাই না আর.........।
(খ) ছিন্ন খঞ্জনার মতো.........।

বাংলার অতুলনীয় সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরে জীবনানন্দ
মানুষকে বিভোর করে রেখেছে তারই বিবরণ এখানে



ভাড়াটে কুঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[**কবি-পরিচিতি ঃ** বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক ও কবি। অসাধারণ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ইনি রবীন্দ্র পুরস্কার এবং অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ইঁহার রচিত 'সাগর থেকে ফেরা' এবং 'সম্রাট' দুইটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ছোটগল্প রচনায় এবং শিশু-সাহিত্য রচনাতেও ইঁহার দক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে। জনপ্রিয় এই প্রবীণ সাহিত্যিক এখনও সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন আছেন।]

ভাড়াটে কুঠি !
নদীর স্রোতের জঞ্জাল-সম আসিয়া জুটি।
ওধারে তাহারা এধারে কাহারা উপরে ও নীচে নানা ;
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই—কেহ নয় কারো জানা।
শুধু দু'বেলায় চোখাচোখি হয় একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে বুঝিবা ধুঁকিছে জ্বরে ;
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি বধূটি শুকায়ে মরে।
নিচে মজলিসে সারাদিন গোল চলিছে দাবার ঘুঁটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
একটি ইটের ব্যবধান রেখে পাশাপাশি থাকি শুয়ে ;
এ-ছাতের জল ও-ছাতে গড়ায় ভিৎ গাড়া একই ভূঁয়ে।
ওইখানে শেষ ; তার পরে আঁটা জানালা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে, কোনখানে যাই ভেসে—
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায় নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়ালে রহে চিরকাল বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥
শুধু কোনো দিন সঙ্গবিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ,
কঠিন দেয়ালে করাঘাত ক'রে ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয় মিছে মরে মাথা কুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। কবি এই কবিতায় ভাড়াটে বাড়ির কোন্ কোন্ বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন?

২। ভাড়াটে কুঠির বিশেষত্বগুলি কবি কি পছন্দ করেন?

৩। 'শুধু কোন দিন সঙ্গবিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ'
—কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই উক্তিটি করেছেন? প্রাণ 'সঙ্গবিহীন' কেন? কেনই বা তা বিদ্রোহ করে? ভাড়াটিয়াদের মধ্যের ব্যবধান কি তাতে অন্তর্হিত হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা লেখ।

২। 'নদীর স্রোতের জঞ্জালসম'—ভাড়াটে কুঠির বৈশিষ্ট্য নিজ ভাষায় প্রকাশ কর।

৩। 'ঘোচে না আড়াল'—কিসের আড়াল? কেন ঘোচে না?

৪। ভাড়াটে কুঠির লোকদের মধ্যে কোথায় তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যবহার কর :
মজলিস, ব্যবধান, সঙ্গবিহীন, ব্যাকুল, করাঘাত।

২। পদান্তর কর :

মজলিস, ব্যাকুল, মাথা, ঘর, চোখ।

৩। পদনির্ণয় কর (মোটা অক্ষরের) :

(ক) **কেহ** নয় কারো জানা

(খ) পাশাপাশি **থাকি** শুয়ে

(গ) স্বামীটির **লাগি** বধূটি

(ঘ) **শুধু** কোনো দিন

(ঙ) **ভাড়াটে** কুঠি

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

কবিতাটির প্রথম স্তবক স্মরণ কর।

ভাড়াটে কুঠির মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেছেন,

উত্তম পুরুষ

অন্নদাশঙ্কর রায়

[কবি-পরিচিতি : লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করের জন্ম ১৯০৪ সালে। আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী চাকুরীতে বৃত হন। ইনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রবন্ধ-রচয়িতা। 'পথে-প্রবাসে', 'জীবন-শিল্প', 'রাঙা ধানের খৈ', 'উড়কি ধানের মুড়কি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে ইনি এক মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছিলেন।]

ভিক্ষুক বলি তাকে—
"নাও নাও" বলে কখনো ডাকে না
"দাও দাও" বলে হাঁকে।

ঘাতকেরও সেই ধারা—
প্রাণ নেবে শুধু, প্রাণ দেবে নাকো,
মারবে, যাবে না মারা।

ব্যবসায়ী তার নাম—
দেয় আর নেয় দুই হাতে তার
দক্ষিণ আর বাম।

সৈনিক সেইমতো
প্রাণের বদলে প্রাণ দেয় নেয়,
ক্ষতের বদলে ক্ষত।

প্রেমিক তারেই মানি,
নেয় নাকো শুধু দিয়ে যায় সব,
রিক্ত উভয় পানি।

ভাই, তুমি অভিনব,
প্রতিদান তুমি নেবে না, কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব।

তোমাদেরই দেওয়া প্রাণে
তোমাদের দেশ প্রাণ পাবে, আর
যুগ পাবে তার মানে।

আর কে বাঁচাবে বলো,
তোমরাই যদি হিসাবীর মতো
বিনিময় বুঝে চলো।

হে বন্ধু, হবে জয়।
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়।

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ঃ

১। কবি এই কবিতায় ভিক্ষুক, ঘাতক, ব্যবসায়ী এবং সৈনিকের কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ?

২। 'হে বন্ধু, হবে জয়।
দানের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি
ব্যর্থ হবার নয়।'

—অংশটি কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃত ? কবি 'বন্ধু' হিসাবে কাকে সম্বোধন করেছেন ? কেন তার জয় হবে ?

'দা নের যজ্ঞে প্রাণের আহুতি'—কথাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৩। এই কবিতায় কবি তোমার সামনে কোন্ আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সংসারে মানুষকে সাধারণতঃ কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ?

২। উত্তম পুরুষ কথার তাৎপর্য কি ?

৩। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৪। এই কবিতায় কোন্ পুরুষকে তোমার উত্তম বলে মনে হয় ? কেন ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। লিঙ্গান্তর কর :

ভিক্ষুক, প্রেমিক, রিক্ত, ভাই, বন্ধু।

২। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

বাম, রিক্ত, বন্ধু, জয়, ব্যর্থ।

৩। অর্থ লেখ :

ক্ষতের বদলে ক্ষত, রিক্ত উভয় পাণি, বিনিময় বুঝে চলো, ব্যর্থ হবার নয়।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। নীচের রেখাচিত্রের বক্তব্য শুদ্ধ কর :

ব্যক্তি	আচরণ
(ক) ভিক্ষুক	শুধু প্রাণ লয়
(খ) ঘাতক	প্রাণ দেয়
(গ) প্রেমিক	নেয় শুধু

২। পরের লাইনটি লেখ :

(ক) প্রেমিক তারেই মানি
....

(খ) তোমাদেরই দেওয়া প্রাণে
....

(গ) হে বন্ধু, হবে জয়,
....

(ঘ) প্রতিদান, তুমি নেবে না, কেবল
....



[**কবি-পরিচিতি ঃ** সুকান্ত ভট্টাচার্য বর্তমান যুগের বহু-আলোচিত প্রতিভাশালী কবি। সাবলীল, প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ ভাষা ইহার কবিতাগুলিকে জনপ্রিয় করিয়াছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র'। অপরাপর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ঘুম নেই', 'মিঠেকড়া', 'হরতাল' প্রভৃতিও সমধিক উল্লেখযোগ্য।]

রানার ছুটেছে, তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে।
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে—
রানার চলেছে, রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার,
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার! রানার!
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে
বোঝাই-জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে,
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো—বুঝি হয় হয় লাল দূরে পূর্বের কোণ।
অবাক্ রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্ ক'রে চায়—
কেমনে মাটিতে রানার সবেগে হরিণের মতো ধায়!

কত গ্রাম কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে,
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌ জোনাকিরা দেয় আলো,
মাভৈঃ রানার, এখনো গলেনি জমাট রাতের কালো।
রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে!
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরের অভাব ; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পৃষ্ঠে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।

এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ।
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা প'ড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি—
রানার! রানার! কী হবে এ বোঝা ব'য়ে ?
কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে,—আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার ;

শপথের চিঠি নিয়ে চল আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রতার গতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, আরো বেগে, ছুটে চলো,
দুর্দম, হে রানার ॥

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন :

১। কবি রানারের জীবনের সুখ ও দুঃখের কাহিনী কিভাবে বিবৃত করেছেন লেখ।

২। 'এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ'
—কার কথা এখানে বলা হয়েছে? তার জীবনের দুঃখ কি? কেন তাঁর দুঃখের কথা কেবলমাত্র পথের তৃণ জানবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। রানার বলতে কাকে বোঝ?
২। রানারের কাজ কি?
৩। রানারের বোঝাতে কি থাকে?
৪। রানারের হাতে কি থাকে?
৫। 'নেই দেরি, নেই আর'—এই দেরি বলতে কি বোঝ?

পাঠ্যগত ব্যাকরণ :

১। অর্থ লেখ ও বাক্যে ব্যাবহার কর :
দিগন্ত, দুর্বার, দুর্জয়, নির্জন, আবেগ, ক্লান্তি, দুর্গম।

২। বিপরীত শব্দ লেখ :
দুর্গম, প্রভাত, দুঃখ, ক্ষয়।

বিষয়াশ্রিত প্রশ্ন :

১। কবিতাটি সঙ্গীত হিসাবে গাও।
২। সূর্য, পৃথিবী, গ্রাম—এদের তিনটি করে সমশব্দ বল।

সাহিত্য দর্পণ

